সৌমিত্র বিশ্বাস

হেরুক





হেরুক শুধুমাত্র রহস্য-রোমাঞ্চের কাহিনি বা ভিন্নতর জীবনদর্শনের আখ্যান নয়, রোমাঞ্চের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতীক বা সিম্বলজি নিয়ে লেখা এমন এক উপন্যাস যা এখনও অবধি বাংলাভাষায় বিরল।

সৌমিত্র বিশ্বাসের জন্ম জুলাই ১৯৬৫। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অর্থনীতির স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করার পর রাজ্য সরকারের আধিকারিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সাহিত্যচর্চা ছাত্রজীবন থেকেই। মাসিক আনন্দমেলা-র 'তোমাদের পাতা'য় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মুখোশ' দেশ পত্রিকা আয়োজিত রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। পরবর্তীকালেও দেশ-এ গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস 'হেরুক' ১৪১৬-র শারদীয়া উনিশ-কুড়িতে প্রকাশিত। ধর্ম, দর্শন এবং আরও বহু বিষয় নিয়ে চর্চা করেন। অবসর সময়ে ভালবাসেন বই পড়তে, বেড়াতে এবং সমাজসেবা করতে।

আ ন ন্দ ন ভে লা

হেরুক

সৌমিত্র বিশ্বাস



আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

ISBN 978-81-7756-867-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

১০০.০০

তিষ্য ও শম্পাকে,
বাবা ও মাকে

প্রথম পর্ব

॥ ১ ॥

ঘরটার দরজা-জানলা বন্ধ। যদিও বন্ধ রাখার দরকার ছিল না, এত রাতে জঙ্গলে কেউ ঢুকবে না। ফরেস্ট গার্ডরাও এই সময় এদিকে আসে না। চারপাশ নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। শুধু কুলকুল করে নদীর শব্দ। ঘরটা যেখানে, সেখান থেকে আরও অনেকটা জায়গা নিয়ে জঙ্গল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। তার ওপারে গ্রাম। বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখলে কোনও মঠ বলে মনে হবে। কিন্তু ভিতরে কী আছে, কেউ জানে না। এমনিতে স্থানীয় লোকজন ছাড়া এই জায়গাটার কথা খুব বেশি লোক জানেও না। মাঝে-মধ্যে এক-আধজন টুরিস্ট আসে, ভিতরে ঢুকে ছবি-টবি তুলে চলে যায়। স্থানীয় লোকজন মঠটা এড়িয়ে চলে। দিনের বেলায় যারা কাঠ কুড়োতে আসে, তারাও এদিকটায় বড় একটা ঘেঁষে না আর এত রাতে তো কথাই নেই। তবুও ওরা কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি।

মেঝেতে একটা অদ্ভুত ছবি আঁকা। লাল রঙের একটা বৃত্ত, তাকে ঘিরে ছোট-ছোট ১০৮টা অর্ধবৃত্ত। মাঝখানে একটা তারার মতো কিছু আঁকা। তার মধ্যে আবার একটা বৃত্ত। এই অদ্ভুত ছবিটার উপরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের শিখার দিকে, সেদিকে একজন বয়স্ক লোক বসে আছেন। তাঁর থেকে কিছুটা তফাত রেখে আটজোড়া নারী-পুরুষ পরস্পরকে ছুঁয়ে বসে আছে। তাদের হাত কোলের উপরে রাখা এবং আঙুলগুলো একটা বিশেষ মুদ্রায় মোড়া রয়েছে। প্রত্যেকের পাশে একটা অদ্ভুত আকারের পাত্র, তাতে কিছু পানীয় রয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একজন পাত্রটা মুখে তুলে নিচ্ছে। কারও

মুখে কোনও কথা নেই। সকলে নিবিষ্ট হয়ে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে আছে।

নদীর ধারে ছড়ানো পাথরের উপর দিয়ে হঠাৎ একটা হেঁটে যাওয়ার শব্দ হতেই ওরা প্রত্যেকে টানটান হয়ে বসল। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর বয়স্ক মানুষটি বললেন, "ওঁ আঃ হুং।"

বাকিরা ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। এই ব্যক্তি তাদের মুক্তির ঠিকানা দিতে এসেছেন। উনি স্বয়ং বজ্রধর। ওই শব্দঝংকারটা মিলিয়ে যেতেই বাকি স্ত্রী-পুরুষরা একসঙ্গে বলল, ''ওঁ আঃ হুং।'' ঘরটা গমগম করে উঠল।

আবার সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর বজ্রধর বললেন, "আমি তোমাদের নির্বাণ দিতে এসেছি। এই নির্বাণ গৌতম বুদ্ধের চেয়েও বড়। এর নাম মহাসুখ। কিন্তু সেই মহাসুখ পেতে হলে জিনিসটা আদায় করতে হবে। এতদিন যা আড়ালে লুকিয়ে ছিল, এখন তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যে করেই হোক, তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো। কোনও কিছুতেই পিছপা হয়ো না। জেনে রাখো, এর জন্যে কোনও পাপ তোমাদের হবে না। তোমাদের উদ্ধারের দায়িত্ব আমার। ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং হুং ফট স্বাহা।"

ওরা সকলে সমস্বরে বলল, "ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং হুং ফট স্বাহা," তারপর উঠে বয়স্ক মানুষটিকে প্রণাম করে একে-একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনি একলা চুপ করে বসে রইলেন। সামনে প্রদীপ জ্বলছে। বাইরে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক। তিনি একদৃষ্টে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করছেন কোথায় আছে জিনিসটা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না। মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে। যতক্ষণ না ওটা পাচ্ছেন, ওঁর চঞ্চলতা থামবে না। ততদিন খুব সাবধানে থাকতে হবে। একটু আগে কে হেঁটে গিয়েছে এখান দিয়ে?

কতক্ষণ বসে ছিলেন ঠিক নেই। আচমকা সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। গাছের মাথা থেকে পাখিরা তারস্বরে ডাকাডাকি শুরু করল। শব্দটা হতেই উনি চমকে উঠেছিলেন। তারপরই প্রবল বিরক্তিতে মাথা নাড়লেন। এভাবে হয় না। বহুবার

ওদের সাবধানে যাতায়াত করতে বলেছেন যাতে এই আস্তানাটার কথা কেউ টের না পায়। এই রাতদুপুরে ওভাবে গুলি চালানোর কী দরকারটা ছিল?

বেশ কিছুক্ষণ পাখিগুলো ডাকাডাকি করে চুপ করে গেল। মধ্যরাতের জঙ্গল আবার থমথম করছে। বজ্রধর একদৃষ্টে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে আবার মনঃসংযোগের চেষ্টা করলেন। এখন নিকষ অন্ধকারে বসে তিনি ভাবলেন, জিনিসটা তাঁর চাই। ওটা বহু বছর অপাত্রে পড়ে আছে। অথচ তিনি যে ইতিহাস শুনেছেন, তাতে তাঁদের মালিকানাই প্রমাণিত হয়। উড্ডীয়ান থেকে কী করে ওটা হাত বদল হল, কেউ জানে না। তাঁর পূর্বসূরিরা বহু চেষ্টা করেছেন ওর হদিশ পাওয়ার। উনি নিজেও বহুদিনের চেষ্টায় সামান্য খোঁজ পেয়েছেন। তাঁর গুরু বলেছিলেন যে, শরীর-মন-প্রাণ একাত্ম করে ওর উপরে মনঃসংযোগ করতে। তা হলে একসময় প্রকৃতি নিজের হাতেই জিনিসটা তুলে দেবে। তাঁর পূর্বসূরিরা ওটার খোঁজ না পেলেও মনে হচ্ছে, অজস্র লোকের সম্মিলিত মনঃসংযোগের ফলে, তিনি হয়তো জিনিসটার সন্ধান পেয়েছেন। যখন প্রকৃতি এতটাই এগিয়ে দিয়েছে, বজ্রধর ভরসা রাখেন, বাকিটুকুও হয়ে যাবে। বজ্রধৃক খবর পাঠিয়েছে যে, তারা রওনা হয়েছে এবং সে নিজেও ওদের সঙ্গে আসছে। এই খবর শোনার পর থেকেই বজ্রধরের একটা ছটফটানি শুরু হয়েছে। ওরা এলে, যে করেই হোক, জিনিসটার সন্ধান পেতে হবে। সামনের চর্তুদশীতে চক্রে বসতে হবে।

বজ্রধর পরবর্তী কাজগুলো ভেবে নিলেন। এই রাতটা বৃথা যাবে? তার চেয়ে চণ্ডালীকে ডেকে নিলেও হয়। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অপরিসীম শান্তি চারদিকে। একটু আগেই যে গুলির শব্দ হয়েছিল, তার কোনও চিহ্নই আর নেই। অন্ধকার জঙ্গলের পথ ধরে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি নিশ্চিত আর কেউ তাঁর পিছু নেবে না।

॥ ২ ॥

"বল তো, সোলার কুকারের বাংলা কি?"

"জানি না!"

"একটা হিন্ট দিচ্ছি। সোলার মানে সূর্য সংক্রান্ত আর কুকার মানে......."

"কুকার মানে জানি, প্রেশার কুকার।"

"অথবা যে রান্না করে, রাঁধুনি।"

"সেটা তো কুক, কুকার নয়।"

"ধরে নে কুকার। এবার বের কর, সোলার কুকারের বাংলা কী হবে?"

"পারব না।"

"খুব সোজা, রবি ঠাকুর!"

পূষণের কথা শুনে সকলে হেসে উঠল। পূষণ রিয়ার দিকে তাকিয়ে পরের প্রশ্নটা ছুড়ে দিল, "কুকুরের খাবার পাত্র এককথায় কী হবে?"

"জানি না।" সমবেত উত্তর।

"ডগ-মগ, যেটা এখন রিয়া হয়ে রয়েছে।"

আবার সমস্বরে হাসি। সুনন্দা বললেন, "সত্যি, এর মাথা থেকে বেরোয়ও বটে!"

রিয়া আদুরে গলায় বলল, "ইল্লি! আমি একাই ডগমগ না? আর তোমরা সকলে যেন নির্বিকার! নিজেই তো বলছিলে, 'দারুণ থ্রিলিং লাগছে।' "

"সে তো এখনও বলছি, থ্রিলিং লাগছে," পূষণ উত্তর দিল, "কিন্তু তোর মতো কেউ লাফাচ্ছি না!"

বরের কথা শুনতে-শুনতে মৃগাঙ্কর মুখে হাসি ফুটেছে দেখে মিত্রা কিছুটা আশ্বস্ত হল। আসলে সঞ্জয়জেঠুর ফোন আসার পর থেকেই ওর বাবা কীরকম চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ফোনটা রেখেই বারান্দার ধারে চলে গিয়ে দরজাটা ঠেলেছিলেন।

কাঁকুড়গাছির ভিতরে মিত্রাদের বাড়িটা বেশ মজার। দেখলে মনে হবে, তিনটে আলাদা-আলাদা বাড়ি, কিন্তু আসলে একটাই।

একটাই লম্বা বারান্দা বড় ভাই মৃগাঙ্কশেখরের দিক থেকে শুরু হয়ে ছোট ভাই অভ্রশেখরের দিক অবধি চলে গিয়েছে। মাঝখানটা মেজ ভাই সুধাংশুশেখরের। তাঁর দুই ছেলেমেয়ে, কিঙ্কর আর দিয়া। মৃগাঙ্কশেখরের একটিই মেয়ে, মিত্রা। অভ্রশেখরের এক ছেলে, অনি।

দরজা ঠেলার পরই সুধাংশুশেখর বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে স্ত্রী নীলিমাও। দাদাকে এত রাতে দরজা ঠেলতে দেখে, দু'জনেই ঘাবড়েও গিয়েছিলেন। সব শোনার পর, সেই রাতেই অভ্রশেখর আর ঊর্মিলাকে ডেকে আলোচনা শুরু হল।

সঞ্জয়জেঠু নাকি বলেছেন, ইমিডিয়েটলি একবার যাওয়া দরকার না হলে বাড়ি রাখা যাবে না। এমনিতেই এত বড় বাড়ি পড়ে আছে দেখে লোকাল পার্টি এটাকে দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নেহাত সঞ্জয়জেঠু নিজে পার্টির ভেটেরান সদস্য বলে এখনও কিছু হয়নি। তার মধ্যে নতুন উৎপাতও শুরু হয়েছে। অসম আর বাংলাদেশ থেকে প্রচুর লোক এসে বাড়িটার খোঁজখবর নিচ্ছে। মাঝে মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারাওয়ালা কিছু লোক এসে বাড়িটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সঞ্জয়জেঠু না করে দিয়েছিলেন। তাতে ওরা চেঁচামেচি শুরু করে, শাসিয়েও যায়। তাই নিয়ে প্রচুর গন্ডগোল। তারপর পার্টির লোকজন চলে আসে। শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়জেঠু থানায় একটা জেনারেল ডায়েরি করে রাখেন। লোকগুলো বলেছিল যে, ওরা একটা ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ, ওরা জঙ্গি! সঞ্জয়বাবু তারপরই মৃগাঙ্কশেখরকে ফোন করে বলেছেন, "তোমাদের বাড়ি এবার তোমরা বুঝে নাও। আমি আর একলা সামলাতে পারব না। কোনদিন কী হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই!"

১৮৭০ সাল নাগাদ যখন রেভারেন্ড ম্যাকফারলেন কালিম্পং-এ প্রথম স্কুল তৈরি করেন, তখন তাঁর সঙ্গে আরও অনেক মিশনারি এখানে এসেছিলেন। সেরকমই এক মিশনারি রেভারেন্ড ম্যাকআর্থার এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ১৯১৫ নাগাদ তিনি স্কটল্যান্ড ফিরে যান। ওই সময় মৃগাঙ্কশেখরের দাদু গৌরীকান্ত রায় এসেছিলেন কালিম্পং-এ। প্রায় দেড় বিঘে জমির উপর বাগানসমেত বাড়িটা দেখেই তাঁর পছন্দ

হয়ে যায় এবং তিনি কিনে ফেলেন। কালিম্পং এমনিতেই তাঁর ভীষণ প্রিয় জায়গা ছিল, এখন নিজের একটা বাড়ি হয়ে যাওয়ায় বছরে তিন থেকে চার মাস ওখানে কাটাতে শুরু করলেন। এদিকে তখন হাইকোর্টে তাঁর জমজমাট প্র্যাক্টিস। কিন্তু কখনও টানা ছুটি পড়লেই তিনি কালিম্পং-এ চলে আসতেন। এমনকী তিনি মারাও যান ওখানে। তাঁর একমাত্র ছেলে ইন্দুশেখর তখন শান্তিনিকেতনে পড়ছে। গৌরীকান্তের স্ত্রী আর কোনওদিনই এখানে পা দেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর এখানকার পাট এক হিসেবে চুকেই গিয়েছিল। এখন যাঁরা উত্তরসূরি রয়েছেন, তাঁরা বাড়িটা রেখে দিয়েছেন। খুব নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যে আসেন।

সঞ্জয়ই সব দেখাশোনা করেন। নাম শুনে যাই মনে হোক, উনি আসলে তিব্বতি। নামটা ইংরেজিতে লিখলে উচ্চারণ দাঁড়ায় স্যানগে। কিন্তু সেটার আসল উচ্চারণ নাকি 'স্যাঞ্জে', তিব্বতিতে তার মানে বুদ্ধ। স্যাঞ্জেকে মৃগাঙ্করা 'সঞ্জয়' করে নিয়েছে। সেরকমই ইংরেজি বানানে 'জিগমে' মনে হলেও, সঞ্জয়ের বাবার নামটা তিব্বতি উচ্চারণে 'জিম্মে' অর্থাৎ নির্ভীক! জিম্মেই বাড়িটার একটা অংশ ইন্দুশেখরের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন। এখন তাঁর ছেলে সঞ্জয় এখানে থাকে।

এখানে এলেই মিত্রার একটা রোমাঞ্চ লাগে। এত বড় বাড়িটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ির দশ-বারোটা ঘরের একটায় সঞ্জয়জেঠু থাকেন। বাকিগুলো কোনওটা খালি, কোনওটাতে আসবাবপত্র রয়েছে, কোনওটায় পুরনো তোরঙ্গ। তার মধ্যে কী আছে কে জানে! কেউ কোনওদিন খুলেও দেখেনি। পিছনের বাগানটাও কী বিশাল! অযত্নে চারপাশে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার ঠিক নীচেই জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়েছে। অবশ্য সামনের বাগান আর পিছনের মন্দির-টন্দির মিলিয়ে ওদের কলকাতার বাড়িটাও বিশাল। বাইরে থেকে দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না যে, কাঁকুড়গাছির মতো জায়গায় এত বড় একখানা বাড়ি রয়েছে, যার সামনে শুধু বাগান নয়, পিছনে একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির আর দুটো শিবমন্দিরও আছে! সবটাই সেই গৌরীকান্তের কীর্তি।

"পূষণদা, আরও আছে তোমার স্টকে?" কিঙ্কর প্রশ্ন করল।

"ভোরবেলা যে ব্যায়াম করা হয়, তাকে কী বলে?" পূষণের প্রশ্নে যথারীতি সবাই বলল, "জানি না।"

"পি টি উষা।"

বড়কাকুর মানে সুধাংশুর অট্টহাসি থামতে পূষণ জিজ্ঞেস করল, "যে গাড়ির দুটো হেডলাইট ভাঙা, তাকে কী বলে?"

"কী বলে গো?" দিয়া আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল।

"অন্ধ-কার। রেশন কার্ডের বাংলা?"

"জানি না।"

"খাইবার পাস!"

আবার তুমুল হাসি। মা-কাকিমা-পিসিরাও হাসতে শুরু করেছেন। রিয়া, মানে মিত্রার পিসতুতো বোন বলল, "পূষণদা, এনকোর এনকোর!"

"এনকোর নয়, উচ্চারণটা অঁকোর।" দিয়া বলল। ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভরতি হয়েছে।

"জ্ঞান দিবি না। চুপ কর!" রিয়া বোনকে দাবড়ানি দিল।

ট্রেনের স্পিড কমতে শুরু করেছিল। পাশ দিয়ে তীব্র শব্দ তুলে একটা মালগাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার ট্রেনের গতি বাড়তে শুরু করল। ইতিমধ্যে রিয়া আবদার শুরু করেছে, "ও পূষণদা, আরও বলো না।"

ট্রেনটা বড় কোনও স্টেশনে থেমেছে। সুধাংশু ছেলে কিঙ্করকে বললেন, "দ্যাখ তো, কোথায় এলাম। মনে হচ্ছে বর্ধমান। মিহিদানা পেলে নিয়ে নেব।"

"মিহিদানা? কী হবে? স্টেশনের মিহিদানা অতি অখাদ্য।" সুনীল বললেন।

এখান থেকে নতুন কেউই উঠল না। ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকাই যাচ্ছে। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে আর কোনওদিন কালিম্পং-এ আসা হবে কি না, কেউ জানে না। সেই জন্যই দাদারা তিনজনেই সপরিবারে যাচ্ছে শোনামাত্র সবিতা মানে মৃগাঙ্কর বোন ঠিক করলেন, উনি, সুনীল আর মেয়ে রিয়াও যাবে। কাজেই পাশাপাশি দুটো কুপ আর দুটো সাইড আপার, সাইড লোয়ার মিলিয়ে ওরাই চোদ্দোজন। তারপর আবার লোক রয়েছে।

ট্রেনটা চলতে শুরু করতেই কিঙ্কর উঠে দাঁড়াল, বাথরুমে যাবে। ওর পিছন-পিছন লাল আলখাল্লা পরা একজন বাথরুমের দিকে গেল। সেটা দেখেই পূষণ অনিকে বলল, "বল তো, তিব্বতি মহিলাকে প্যারিসে কী বলে ডাকা হয়?"

"জানি না।"

"লা-মা!"

রিয়া আর দিয়া হি-হি করে করে হেসে উঠল। মিত্রা বলল, "কী হচ্ছে! শুনতে পাবে যে!"

"শুনতে পেলেই বা কী? ওরা তিব্বতি ভাষা ছাড়া আর কিছু বোঝে না।" পূষণ উত্তর দিল।

সুনন্দা বললেন, "অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়েছে। লামা মানে তো তিব্বতি সন্ন্যাসী, তাই না?"

"ধুর," সুধাংশু বললেন, "এগুলো থোড়াই তিব্বতি! হয় নেপাল না হলে ভুটান।"

"তাই?"

"আবার কী!"

রিয়া বলল, "এগুলো আজকাল খুব ঘুরঘুর করে। কবে যেন একদিন দেখি, আমাদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"বলা যায় না," মৃগাঙ্ক বললেন, "এরা হয়তো সত্যি তিব্বতি। পালিয়ে এসে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম খুঁজছে।"

পাশ দিয়ে সেই ছেলেটা আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। তার পিছন-পিছন কিঙ্কর ফিরে এসে বলল, "এই যে ছেলেটা গেল এখনই, আমাদের ওদিকে থাকে।"

"ধ্যাত!" অনি বলল।

"মা কালী," কিঙ্কর বলল, "আমি ওকে প্রায়ই দেখি। ইন ফ্যাক্ট পরশু সন্ধেবেলা আমি মাঠ থেকে ফিরছিলাম, ও আমাদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে কী করছিল। সঙ্গে আর একটা লোকও ছিল, একই ড্রেস পরা। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, কাকে খুঁজছে। তাতে বলল, কাউকে খুঁজছে না। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, ও আমাদের মন্দিরটা দেখতে আসতে পারে কি না। আমি ওকে বললাম, 'ইউ আর

ওয়েলকাম।' তখন ও আমার সঙ্গে ভিতরে ঢুকে শিবমন্দিরে প্রণাম করেছিল। আমি ওকে ঘরেও ডেকেছিলাম, আসেনি।"

দিয়া বলল, "কথা বল ওর সঙ্গে।"

"চিনতে পারল না যে!" কিঙ্কর কাঁচুমাচু মুখে বলল।

"সে কী রে, চিনতেই পারল না? এত বড় হ্যাটা মেরে দিল!" রিয়া হাসছে।

"তো আমি কী করব। ও যদি না চেনে, তার জন্যে কি আমি দায়ী?"

॥ ৩ ॥

ট্রেনটা যখন সাঁইথিয়া পার হচ্ছে তখন মৃগাঙ্কর মোবাইল বেজে উঠল। তিনি ফোনটা তুলে ওপারের কথা শুনতে-শুনতে শুধু একবার বললেন, "এগজ্যাক্টলি কখন হয়েছে?"

তারপর খানিকক্ষণ হুঁ-হুঁ করে সায় দিয়ে গেলেন। রাখার আগে বললেন, "ঠিক আছে। আমরা কাল সকালে পৌঁছোচ্ছি। তারপর একটা ডিসিশন নেওয়া হবে। আপনি পার্টির সেক্রেটারিকে কাল বিকেলেই আসতে বলে দিন।"

ফোনটা রাখার পর সুনন্দা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? সঞ্জয়দা কিছু বললেন?"

মৃগাঙ্ক বললেন, "আজ সন্ধেবেলা পিছনের বাগানে ওরা ঢুকেছিল। আগুন জ্বালিয়ে কী সব করছিল।"

"তারপর?" অভ্র জিজ্ঞেস করলেন।

"দেখতে পেয়ে সঞ্জয়দা নীচে গিয়ে চেঁচামেচি করেন। তাতে ওরা পাত্তাও দেয়নি। এদিকে হাঁকডাক শুনে পুরন এগিয়ে আসে।"

"পুরন মানে?" সুধাংশু বললেন, "ওই যে ছেলেটাকে উনি রেখেছেন রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য?"

"হ্যাঁ। সেও এসে চেঁচামেচি করে। তখন লোকগুলো গালাগাল দিতে-দিতে চলে যায়। সঞ্জয়দা বলতে-বলতে কাঁপছিলেন। বয়স

হয়েছে, নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। ওরা যদি সত্যি জঙ্গি হয়, তা হলে চিন্তার ব্যাপার!"

সুনন্দা বললেন, "এখন তো টেনশন করে লাভ নেই। কাল গিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার মনে হয়, অনেক মায়া হয়েছে পিতৃপুরুষের বাড়ির জন্য। এবার ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তোমরা ভাই-বোনরা আলোচনা করো। আমার যা মনে হয় বললাম।"

গুড়গুড় শব্দ করে একটা নদী পেরিয়ে ট্রেনটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। সুনীল বললেন, "বড়বউদি ঠিকই বলেছেন। এবার ওটা বেচে দেওয়াই ভাল। আমার মনে হয় এবারই ফাইনাল কথা বলে আসা দরকার।"

সুনন্দা বললেন, "সঞ্জয়দারই বা কী আক্কেল! জানেনই তো, আমরা কাল যাচ্ছি। এখনই ফোনটা না করলে চলছিল না?"

সুধাংশু বললেন, "বয়স হয়েছে তো, টেনশন করেন! কে বলবে, উনি আসলে ভাড়াটে? বাড়িটাকে তো বুক দিয়ে আগলে রাখেন! জেনুইন লোক।"

"তাই?" কিঙ্কর বলল। ও এখন সেকেন্ড ইয়ার ফিজিক্স অনার্স। কলেজের রাজনীতিতে ভালমতোই জড়িয়ে আছে। ও শুনেছে, সঞ্জয়জেঠু কালিম্পং-এ পার্টির একটা বড় মাথা। সে ব্যাপারে তার কৌতূহল আছে।

সুধাংশু বললেন, "নিশ্চয়ই। বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। তারপর একটা সময় দুম করে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন, কে জানে! তারপর আবার ফিরে এলেন।"

"কোথায় গিয়েছিলেন? আন্ডারগ্রাউন্ড?" কিঙ্কর জিজ্ঞেস করল।

"বলতে চান না," সুধাংশু উত্তর দিলেন, "জিজ্ঞেস করলে মিটিমিটি হাসেন। মানুষটার লিডারশিপ কোয়ালিটি দুর্ধর্ষ।"

"সঞ্জয়দার তো?" মৃগাঙ্ক বললেন, "ওদিকে পার্টিটাকে তো প্রায় একা হাতে তৈরি করেছেন। চলো, রাত হল। এবার শুয়ে পড়া যাক।"

কিন্তু বললেই তো আর কেউ শুয়ে পড়বে না। বিছানা পাততে-পাততেই আবার একটা-দুটো কথা শুরু হল। সুনীল বললেন, "দাদা আমার কিন্তু মনে হয়, এবার একটা ডিসিশনে চলে আসা দরকার।"

"সে তো বটেই," মৃগাঙ্ক উত্তর দিলেন, "আমার তো ইচ্ছে এবারই ফাইনাল করে আসার।"

রিয়া বলল, "পারবে? এত জিনিসপত্র রয়েছে!"

"সব ডিসপোজ় অফ করে দেব!" সুধাংশু বললেন।

"সব ডিসপোজ় অফ করে দেবে?" মিত্রা আর্তনাদ করে উঠল, "কী আছে, সেসব না দেখেই?"

"আহা, ডিসপোজ় অফ করা হবে মানে কি আর কালকেই করা হচ্ছে?" সুধাংশু বললেন, "তার তো একটা মিনিমাম সময় লাগবে। তার মধ্যে দেখে নিলেই হল। তবে সেরকম কিছু আছে বলে মনে হয় না।"

"কী করে জানলে?" অনি জিজ্ঞেস করল, "ডেড সি স্ক্রোলের মতো যদি কিছু থাকে?" অনি এখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। খুব রিসেন্টলি একটা অল ইন্ডিয়া কুইজ় কম্পিটিশনে স্কুল রিপ্রেজ়েন্ট করে এসেছে।

"ডেড সি স্ক্রোল ব্যাপারটা কী?" প্রশ্ন করল দিয়া।

থার্ড ইয়ারে পড়লেও দিদি এই বিষয়ে কিছু জানে না দেখে অনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দিয়ার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "ডেড সি-র উত্তরপশ্চিম প্রান্তে এগারোটা গুহার মধ্যে প্রচুর পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। ওগুলো সব হিব্রু বাইবেলের ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ওর মধ্যে নাকি যিশুর জীবনের এমন সব ঘটনা বলা আছে, যা অ্যাদ্দিন অজানাই ছিল।"

"আচ্ছা," অভ্র বললেন, "কবেকার ঘটনা এটা? আই মিন পাওয়া গিয়েছে কবে?"

"১৯৪৭।" অনি উত্তর দিল।

আলোচনাটা এখান থেকে ঘুরে গেল অদ্ভুত জিনিসপত্র আবিষ্কারের দিকে।

মিত্রা পূষণকে বলল, "তোমার সেই ঘটনাটা বলো।"

পূষণ বলল, "বার্বারা টেস্টা বলে হলিউডের এক লাইব্রেরিয়ান তার দাদুর সম্পত্তি হিসেবে ছ'খানা বড় ট্রাঙ্ক পেয়েছিল। প্রত্যেকটা কাগজপত্রে বোঝাই। ১৯৬১ সাল থেকে অল্প-অল্প করে ঘাঁটতে-ঘাঁটতে শেষে একখানা পাণ্ডুলিপি বেরোল। এর মধ্যে বছর তিরিশ কেটে গিয়েছে। পাণ্ডুলিপিটা মার্ক টোয়েনের 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস্ অফ হাক্‌লবেরি ফিন'-এর প্রথম অংশ। ওরিজিন্যাল!"

"বাঃ, বেশ ইন্টারেস্টিং ঘটনা তো," সুনীল বললেন। তারপরে রিয়া-কিঙ্করদের দিকে ফিরে বললেন, "কাল পৌঁছে তোরাও ফিল্ডে নেমে পড়। প্রচুর পুরনো তোরঙ্গ আছে। কপাল ভাল থাকলে তন্ত্রের পুরনো বই বেরোতে পারে," বলে সুনীল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

পূষণ জিজ্ঞেস করল, "তন্ত্রের বই মানে?"

সবিতা বললেন, "আমাদের বাড়িতে শুনেছি নাকি তন্ত্রের চর্চাটর্চা হত।"

"তাই?" পূষণ খুব উৎসাহী হয়ে পড়ল, "কে করত?"

"সকলেই," সবিতা বললেন, "বাবার আমল থেকে ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়।"

"এক্সকিউজ় মি," সামনে সেই লামা ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে একটা খালি জলের বোতল, "ডু ইউ হ্যাভ..."

কথাটা শেষ করার আগেই কিঙ্কর বলল, "সার্টেনলি!" তারপর একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল বের করে "ইউ ক্যান কিপ দিস। উই হ্যাভন্ট ইউজ়্ড ইট।" বলে লামার দিকে তাকিয়ে পরিচিতের ভঙ্গিতে হাসল।

"থ্যাঙ্কস," লামা নুইয়ে পড়ল, "মে লর্ড হেরো ব্লেস ইউ।"

কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হল না, ও কিঙ্করকে চেনে। বরং ওর চোখ রিয়ার দিকেই আটকে ছিল। রিয়াও কৌতূহলবশত ওর দিকে তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল।

লামা চলে যেতেই দিয়া বলল "লর্ড হেরোটা আবার কে?"

পূষণ গম্ভীরভাবে বলল,"লর্ডসের মাঠে যে টিম হেরে যায়, তার ক্যাপ্টেনকে লর্ড হেরো বলে। যারা জেতে তারা লর্ড জেতো!"

"তাই?" দিয়া প্রথমে ধরতে পারেনি, তারপর মিত্রার হাসি দেখে নিজেও হেসে ফেলে বলল, "ধ্যাত, যত আজেবাজে কথা!"

এরপর আস্তে-আস্তে গল্প থেমে গেল। কেউ বাঙ্কের উপর, কেউ বা নীচে গড়িয়ে গেল, কামরার সব আলো নিভে গেল। গাড়িভরতি ঘুম। মাঝে মাঝে কোনও স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল, তারপর আবার চলতে শুরু করল। কোন স্টেশন উঠে দ্যাখার ইচ্ছেও সবসময় থাকে না।

রিয়ার ঘুম আসছে না। তার পাশের বাঙ্কটাতে পূষণ শুয়েছে। বেড

ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেখে কী একটা বই পড়ছে। নীচের বাঙ্কের একটাতে কিঙ্কর আর-একটাতে মিত্রা। পাশের কুপ দুটোতে বাকিরা।

চিত হয়ে শুয়ে, পূষণের দিকে মুখটা ফিরিয়ে, চোখের উপরে হাত রেখে রিয়া শুয়েছিল। হাতের ফাঁক দিয়ে পূষণকে দেখছিল। সন্ধে থেকে অনেক গল্প হয়েছে, পিছনে লাগা হয়েছে, তারপর আলোচনা জটিল হয়েছে। কিন্তু রিয়ার মাথায় সেসব কিছুই নেই। ও পূষণকে দেখছে।

মিত্রাদি কপাল করেছিল বটে! গ্র্যাজুয়েশন আর মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। নেট কোয়ালিফাই করে ইউজিসি স্কলারশিপ নিয়ে রিসার্চও শেষ করে ফেলল। এখন একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ফেলো হিসেবে রয়েছে। প্রায়ই কনফারেন্সে বাইরে যায়। আর ওরকম একটা বর। নামকরা ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক।

লুকিয়ে পূষণকে দেখতে-দেখতে রিয়ার হঠাৎ মনে হল, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। পূষণদাকে এখনও কথাটা বলা হয়নি। ওখানে গিয়ে যদি কোনও ফাঁকা ঘর পায়, তবে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলতেই হবে। না হলে কলকাতায় ফিরে এসেই বলতে হবে। এখনও পর্যন্ত ও বিয়েটা ঠেকিয়ে রেখেছে, কিন্তু সেটা বোধহয় আর সম্ভব হবে না।

এমএ শেষ হতেই ভাগ্যিস বিএড-এ ভরতি হয়েছিল রিয়া! তাই এখন বিয়ের কথা উঠলেই বলতে পারে, যতক্ষণ না পড়া শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ বিয়ে করবে না। কিন্তু সেটাই বা আর ক'দিন? কাজেই যা বলার, ঝটপট পূষণকে বলে দিতে হবে। খুব সম্ভবত ও রাজি হবে না। কিন্তু ও যদি সকলকে জানিয়ে দেয়? কেলেঙ্কারি হবে!

করিডোরে একটা পায়ের শব্দ হল। তারপরই ওদের কুপের পর্দাটা সরে গেল। সেই লামা! আস্তে-আস্তে ভিতরে আসার চেষ্টা করছে।

"ইয়েস?" নীচের বাঙ্ক থেকে মিত্রা উঠে বসেছে, "হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?"

লামা একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, "স্যরি, এক্সট্রিমলি সরি। অ্যাকচুয়ালি ইন ডার্কনেস..." বলতে-বলতে ও বেরিয়ে গেল।

মিত্রা আবার শুয়ে পড়ল। উপর থেকে পূষণ ফুট কাটল, "ডার্কনেস না হাতি। এসেছিস তো একজনকে ঝারি করতে!"

"পূষণদা ভাল হবে না কিন্তু!" রিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

মিত্রা হাসতে-হাসতে বলল, "তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? তোর নাম তো আর করেনি।"

"না করলেই বা," রিয়া রাগের ভান করল, "সবই বোঝা যায়।"

কিঙ্কর হাসছিল। হাসতে-হাসতেই বলল, "জল নিতে এসে লোকটা রিয়াদিকেই দেখছিল।"

"দ্যাখ, সকলে তোদের ব্যাপারস্যাপার ধরে ফেলেছে," পূষণ বলল, "অবশ্য বেচারাকে দোষও দেওয়া যায় না। লামা হলেই বা? বয়সটা তো দেখতে হবে!"

"ধুর, আমি কোনও কথাই বলব না।" রিয়া মুখ ঢেকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

"মুখ ঢাকছিস কেন? লামাটার কথা ভাবছিস?" মিত্রা হাসছে।

পূষণ নিজের মনেই বলল, "মনে হচ্ছে, সকলকে ছেড়ে লামা-ই জামাই!"

এবার রিয়াও হাসতে শুরু করল।

॥ ৪ ॥

জঙ্গল আর গ্রাম যেখানে মিলেছে, সেখানেই রামবাহাদুর পড়ে ছিল। গুলিটা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ না পুলিশ আসে, ওর শরীরটা এভাবেই পড়ে থাকবে। আপাতত গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এটা একটা বড় ঘটনা। গ্রামের লোক ভিড় করেছে। রামবাহাদুরকে নিয়ে আলোচনা চলছে।

পার্টির অন্যান্য নেতার সঙ্গে সঞ্জয়ও রয়েছেন। প্রত্যেকেই বিমর্ষ। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে, নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে পরবর্তী কর্মসূচি আলোচনা করে নিচ্ছিলেন। থানা ঘেরাও করতে হবে, প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিতে হবে এবং সবচেয়ে দরকারি, ইমিডিয়েটলি একটা বন্‌ধ ডাকতে হবে।

'রামবাহাদুর অমর রহে,' 'রামবাহাদুরের হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে' স্লোগান দিতে-দিতে, অন্ত্যেষ্টি শেষ করে এবং

বারো ঘণ্টার বন্‌ধ ঘোষণা করে যখন সঞ্জয়বাবু বাড়ি ফিরলেন, তখন সন্ধে সাতটা।

ছড়ানো গাড়িবারান্দায় সকলে বসে ছিল। ডোম্বি চা দিয়ে গিয়েছে। উলটোদিকে পাইনের জঙ্গল আর তার পিছনে মেঘের আড়ালে পাহাড়ের সারি। ভোরে ট্রেন থেকে নেমে প্রায় আড়াই ঘণ্টা জিপে এসে, ওরা যখন বাড়ি পৌঁছোয়, তখন পুরন আর ডোম্বিই ওদের আপ্যায়ন করে বসিয়েছিল। সঞ্জয়বাবু কখন ফিরবেন ঠিক নেই শুনে ওরা প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ডোম্বি আর পুরন কোথাও কোনও ত্রুটি রাখেনি।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই সঞ্জয় বললেন, "ভেরি সরি। আমাদের একজন কর্মীকে কাল রাতে মেরে দিয়েছে। সেই নিয়ে সারাদিন গিয়েছে। কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

মৃগাঙ্ক, সুধাংশু, অভ্র তিনভাই-ই একসঙ্গে বললেন, "না না, আপনি বসুন।"

"ডোম্বি, অ্যাই ডোম্বি," সঞ্জয়বাবুর হাঁকডাকে ডোম্বি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

উনি নেপালিতে ওকে একটা কিছু জিজ্ঞেস করলেন। ডোম্বি তার উত্তর দিল। তারপর উনি আবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেন। তার উত্তরে ডোম্বি মিষ্টি করে হাসল। সঞ্জয়বাবু বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর-এক রাউন্ড চা হবে কি?"

"তা হতে পারে।" সুধাংশু বললেন।

সঞ্জয় ডোম্বিকে কিছু বলতে, ও ভিতরে চলে গেল।

"কী হয়েছিল?" সুধাংশু প্রশ্ন করলেন।

"কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বেশ রাতে রামবাহাদুর ফিরছিল। একলা পেয়ে মেরে দিয়েছে।"

"কিন্তু কেন? মানে, ওকে খুন করার পিছনে একটা কারণ থাকবে তো?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"ভেবেছে, ওকে সরাতে পারলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে। রামবাহাদুরের মতো একটা কর্মী পাওয়া মানে বিরাট ব্যাপার। কোনওদিন কোনও কাজে ওকে বিরক্ত হতে দেখিনি। ডেডিকেটেড

বলতে যা বোঝায়, ও তাই ছিল।" সঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সঞ্জয় আবার মুখ খুললেন, "একটাই ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না, ও রাতে কেন জঙ্গলের ধারে যেতে গেল? ওকে আগেও শাসিয়েছে। পার্টি থেকে বারবার বলা হয়েছিল, রাতবিরেতে একলা ঘোরাফেরা না করতে। ও কেন গেল?"

"কারা শাসিয়েছিল?" পূষণ আবার জিজ্ঞেস করল।

"বাইরের কিছু লোক। ইন ফ্যাক্ট জায়গাটা এখন এমন হয়ে গিয়েছে যে, লোকজন জঙ্গলটা এড়িয়ে চলে। গত মাসে দুটো মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।"

"সে কী?" সবিতা আতঙ্কিত গলায় বললেন।

"হ্যাঁ! গ্রামেরই দুটো অল্পবয়সি মেয়ে। তিন-চারদিন পর একজনের ডেডবডি পাওয়া যায়। নদীর বেড়ে পড়ে ছিল, মাথাটা নেই। আর-একজন এখনও মিসিং।"

"অ্যাই মেয়েদুটো," রিয়া-দিয়ার দিকে তাকিয়ে নীলিমা শাসন করলেন, "একদম হুটহাট বেরিয়ে যাবি না। সঙ্গে কেউ না থাকলে গেটের বাইরে পা রাখবি না," বলেই মিত্রার দিকে ফিরলেন, "ওদের বলছি মানে ভেবো না যে, তুমি আলাদা। তুমিও বাইরে বেরোবে না।"

"চিন্তার কিছু নেই। সদ্য একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এখন কয়েকদিন ওরা চুপচাপ থাকবে। তোমাদের প্রোগ্রাম ক'দিনের?" সঞ্জয় জিজ্ঞেস করলেন।

"আগামী শনিবার অবধি।"

সঞ্জয় বললেন, "কীরকম অদ্ভুত ব্যাপার জানো, এ মাসে গেল রামবাহাদুর, গত মাসে দুটো মেয়ে। তার আগের মাসটা চুপচাপ ছিল, কিন্তু তার আগেও আর-একটা মেয়ে। তারও মুণ্ডহীন দেহটা পাওয়া যায় নদীর বেড়ে।"

"ইসস্,' সুনন্দা বলে উঠলেন, "কেন হচ্ছে এসব? আগে তো এরকম ছিল না। বিয়ের পর এখানে যখন প্রথম এলাম, আপনার মনে আছে সঞ্জয়দা? কত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরা হত।"

"এখনকার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। তার উপর রেগুলার উৎপাত শুরু হয়েছে। কোন এক রিলিজিয়াস গ্রুপ, তাদের ভাড়া দিতে হবে। হাজারো বায়নাক্কা!" সঞ্জয় থামলেন।

"তারা কারা?" মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

"জানি না, চিনি না। সব বাইরে থেকে এসেছে। তাড়ালে যায় না। কাল তো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল!"

মৃগাঙ্ক বললেন, "এগজ্যাক্টলি কী ঘটেছিল?"

"আমি বিকেলে পার্টি অফিসে গিয়েছিলাম। ফিরতে বেশ দেরি হয়েছিল, রাত প্রায় আটটা হবে। গেট খুলে ঢুকেই দেখি, পিছনে নিমগাছটার নীচে চার-পাঁচজন বসে আগুন জ্বালিয়ে কী করছে। সঙ্গে লাল শাড়ি পরা দু'জন মহিলাও রয়েছে," সঞ্জয় একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, "দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কাছে গিয়ে রাগারাগি করতে ওরাও উলটোপালটা বলতে শুরু করল। তাই নিয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি। আমার গলা পেয়ে পুরনও চলে এসেছিল। ও তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে আরও কিছু লোক ডেকে আনল। তারপর ওই লোকগুলো চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে কী, পুরন আর আমাকে দেখে নেবে!"

সঞ্জয়বাবু গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "এবার ঠান্ডা মাথায় কতগুলো জিনিস বুঝে নাও। প্রথমত, ওরা কারা আমরা জানি না। রিলিজিয়াস গ্রুপ বলছে, কিন্তু যদি দ্যাখা যায় জঙ্গি গোষ্ঠী, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেক্ষেত্রে ওদের ভাড়া দেওয়াটা রিস্কি হয়ে যায়। এদিকে এত বড় বাড়ি, বাগান আর আমি একলা মানুষ। কত দিকে নজর রাখব? ওরা যে আবার ঢুকবে না, তার গ্যারান্টি কী?"

"আমার ধারণা কালকেই প্রথম নয়," পূষণ বলল, "ওরা আগেও ঢুকেছে। আগুন জ্বালিয়ে কিছু করেছে।"

"কে বলল?" সঞ্জয় স্পষ্টতই চমকে উঠেছেন।

তার উত্তর না দিয়ে পূষণ বলল, "কাল আপনি লোকগুলোকে নিমগাছের তলায় দেখেছেন তো?"

"হ্যাঁ।" সঞ্জয়বাবুর গলায় কিছুটা বিস্ময়।

পূষণ বলল, "পিছনদিকে অনেকগুলো ছোট-ছোট ঘর রয়েছে, ওগুলো কী?"

"এখন তো এমনিই পড়ে আছে। পুরন কাঠ রাখে। আগে কী ছিল, জানি না।" সঞ্জয়বাবু বললেন।

"আমরাও জানি না," সবিতা বললেন, "তবে গল্প শুনেছি, বাগানে কোথাও মাটির নীচে নাকি ঘর ছিল। সেসব অবশ্য কেউ চোখে দেখিনি।"

"ঘর না তো?" সুধাংশু বললেন, "মাটির নীচ দিয়ে নাকি সুড়ঙ্গ কাটা ছিল!"

"সুড়ঙ্গ কী করে হবে?" সবিতা বললেন, "ঠাকুরমা তো সব সময়ই ঘরের কথা বলতেন। ডাকাতের ভয়ে তৈরি করা হয়েছিল।"

কথা শুনতে-শুনতে পূষণ জিজ্ঞেস করল, "ওদিকে ট্র্যায়াঙ্গল করা রয়েছে, কীসের?"

"ট্র্যায়াঙ্গল? কীসের ট্র্যায়াঙ্গল?" সঞ্জয়বাবু ওর প্রশ্নটা ধরতে পারেননি।

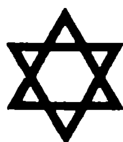
"মাটিতে ইট সাজিয়ে দুটো ট্র্যায়াঙ্গল করা আছে, আর তাদের মাঝখানে একটা স্টার অফ ডেভিড," পূষণ কথা শেষ করার আগেই অনি বলল, "সেটার উপরে আগুনের দাগ রয়েছে। ওই ট্র্যায়াঙ্গল দুটোর মধ্যে যেটা উলটো, সেটাতে আবার সিঁদুর দিয়ে লাভ সাইন করা আছে। আর অন্যটায় সাদা রং দিয়ে।"

"স্টার অফ ডেভিড আবার কী ব্যাপার?" মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

"আরে স্টার অফ ডেভিড মানে ইজ়রায়েল-এর প্রতীক। ওদের জাতীয় পতাকার উপর ওই চিহ্নটা আছে, দ্যাখোনি?" অনি খুব উত্তেজিত।

বড়রা সকলে মাথা নাড়লেন। দেখে থাকলেও কেউ খেয়াল করতে পারছেন না।

অনি আবার বলল, "স্টার অফ ডেভিড দ্যাখোনি তোমরা? আরে এরকম দেখতে," অনি উত্তেজনায় শূন্যে স্টার অফ ডেভিড আঁকতে শুরু করল।



ওকে থামিয়ে দিয়ে পূষণ বলল, "ওটা বেসিক্যালি একটা হেক্সাগ্রাম। দুটো ত্রিভুজকে একটার উপর আর-একটা রেখে, একটা ত্রিভুজকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলে যা হয়। ডেভিড শব্দটার শুরুতে আর শেষে ডি আছে। প্রাচীন হিব্রুতে ডি লেখা হত ত্রিভুজের মতো করে।"

দিয়া বলল, "মানে গ্রিক ডেল্টা?"

"এগজ্যাক্টলি!" পূষণ বলল, "দুটো ডি পরস্পর উলটো করে, একটার উপর একটা বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও আছে।"

"কীরকম?" সঞ্জয় বললেন। ওঁর চোখমুখেও উত্তেজনা।

"স্টার অফ ডেভিড সিগনিফাই করে নাম্বার সেভেন। হেক্সাগনের ছ'টা শীর্ষবিন্দু আর সেন্টার। অনেক রিলিজিয়নেই সাত সংখ্যাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।" পূষণ বলল।

"যেমন আমাদের সপ্তর্ষিমণ্ডল বা সাতটা সুর?" ঊর্মিলা বললেন।

অভ্র বললেন, "কেন, তোমাকে সাতপাক ঘুরে বিয়ে করেছিলাম, মনে নেই?"

সকলে হেসে উঠল। হাসি থামার পর পূষণ বলল, "হিন্দুধর্ম মতে মানুষের শরীরে সাতটা চক্র আছে। ওই সাতটাকে ভেদ করে উঠতে পারলেই অমরত্ব। ওই চক্রের যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে, তার মধ্যেও ওই হেক্সাগ্রাম আছে।"

"তুমি এসব জানো?" সঞ্জয়বাবু কিছুটা আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "আজকালকার ছেলেরা এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে?"

" সেরকম কিছু না, আমি একটু-আধটু পড়াশোনা করেছি।" পূষণ বলল

"যাক গে, যে কথা হচ্ছিল," মৃগাঙ্ক থামিয়ে দিলেন, "সঞ্জয়দা আপনি কী সাজেস্ট করেন?"

"কী আর বলব! পূষণ যখন চিহ্ন দেখেছে, তখন ডেফিনিটলি ওরা আগেও ঢুকেছে বা প্রায়ই ঢোকে, আমাদের চোখে পড়ে না। ওরা কারা সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। জঙ্গি হলে তো মুশকিল!"

"আপনার পার্টি থেকে তো একবার প্রোপোজাল দিয়েছিল এই বাড়িটা কেনার। ওদের সঙ্গে আলোচনা করা যায়। আপনি কি ওদের খবর দিয়েছেন?"

সঞ্জয় বললেন, "দ্যাখো, তোমরা যে আসছ এবং ওদের সঙ্গে বসতে চাইছ, সেটা আমার বলাই আছে। কিন্তু রামবাহাদুরের ব্যাপারটার জন্য আজ আর কাউকে পাওয়া যাবে না। কাল আমরা লোকাল বন্‌ধ ডেকেছি, সুতরাং আগামীকালও কাউকে পাবে না। কাল ফারদার কোনও ঝামেলা না হলে, পরশু কথা বলা যেতে পারে।"

"ঠিক আছে। এখন তো আর কিছুই করার নেই," মৃগাঙ্ক হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "একটা জিনিস দেখুন, যদি..."

বাইরে একটা স্কুটার এসে দাঁড়াল। কেউ সঞ্জয়কে ডাকল।

"এক্সকিউজ় মি," বলে সঞ্জয় উঠে বেরিয়ে গেলেন।

সুধাংশু দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করবে?"

"বিক্রি করলে সঞ্জয়দার পার্টিকেই করা ভাল। ওসব রিলিজিয়াস গ্রুপকে দেব না।"

সঞ্জয় ফিরে এসে বললেন, "সরি, আমাকে এখনই বেরোতে হবে। কাল বন্‌ধ, পার্টির ছেলেদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। কত দেরি হবে জানি না। যদি নাও ফিরি, চিন্তা কোরো না।"

॥ ৫ ॥

সকাল থেকেই বন্‌ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, কোথাও বেরোনো যাবে না। মৃগাঙ্ক, অভ্র, সুধাংশু এবং সুনীল বসেছেন তাস নিয়ে। কিঙ্কর, দিয়া আর অনি বাগানে ঘুরছে। পূষণ পিঠে বালিশ দিয়ে বই পড়ছে। রিয়া আর মিত্রা বারান্দায় বসে কথা বলছে। মিত্রার সঙ্গে গল্প করলেও রিয়া মনে-মনে চাইছে, পূষণ এসে বসুক ওদের সঙ্গে। মা-কাকিমা-পিসিরা রান্নাঘরে। জমিয়ে রান্না করার মতো উপকরণও নেই। বন্‌ধের জন্য কিছু কিনেও আনা যাবে না।

এমন সময় বাগান থেকে হাঁপাতে-হাঁপাতে অনিরা ছুটে এল। দিয়ার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। তিনজনই হুড়মুড় করে কথা শুরু করল। হট্টগোল শুনে পূষণ উঠে এল বাইরে। মৃগাঙ্করাও তাস ফেলে উঠে এলেন।

অনিরা বলল, ওরা বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ মাথায় চলে গিয়েছিল। বাগানের ওই অংশের পাঁচিলের বেশ খানিকটা ভাঙা। ভাঙা পাঁচিল থেকে কিছু দূরে একটা বড় বাঁশঝাড় আছে। তার মাথায় প্রচুর অর্কিড ঝুলে রয়েছে। সেই বাঁশঝাড়ে একটা শব্দ হচ্ছিল। কৌতূহলী হয়ে অনি উঁকি মারতেই দেখে, একটা লোক বসে আছে। মাথায় উঁচু করে বাঁধা জটা, গলায় সাদা-সাদা কীসের মালা। হাতে বালা আর আংটি। লোকটা পিছন ফিরে বসে কিছু করছিল, যাতে ঝোপটা নড়ছিল। ওকে দেখেই অনি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। অনিকে পালাতে দেখে, লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

তিন ভাইবোনের মধ্যে দিয়া বড়। কাজেই ভয় পেলেও, দু'ভাইকে সরিয়ে নিয়ে দিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, "কে তুমি? কী চাই এখানে?"

তার উত্তরে লোকটা বিশ্রীভাবে হেসে ওদের দিকে এগিয়ে আসে। দিয়ারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। লোকটা তখন দিয়ার দিকে একটা আঙুল তুলে দেখায়। স্বাভাবিকভাবেই ওরা তখন ভয় পেয়ে দৌড়োতে শুরু করে। পালাবার সময় অনি একবার পিছনে ফিরে দেখেছে, লোকটা নেই।

ঘটনা শুনে সকলে দিয়াদের বকাবকি শুরু করলেন। কেন এভাবে একলা-একলা ওদিকে গিয়েছে! তারপর মৃগাঙ্ক বললেন, "চল তো, জায়গাটা দেখে আসি। কী আরম্ভ করেছে এরা?"

সকলে দল বেঁধে বাগানে নেমে ওই জায়গাটায় গেল। লোকটাকে অবশ্য পাওয়া গেল না। ঝোপটার ভিতরে গর্ত খোঁড়া রয়েছে। গর্তের মধ্যে কীসব পড়ে রয়েছে।

"কী ওগুলো?" অভ্র বললেন।

পূষণ গর্তটায় হাত ঢুকিয়ে জিনিসগুলো বের করে আনল। বারোটা ছোট মাটির ঘট। দুটো-দুটো করে ছ'জোড়ায় রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটা ঘটের গায়েই কালো কালি লেগে রয়েছে, সম্ভবত এগুলোতে আগুনে ধরানো হয়েছিল। ওখানে দাঁড়িয়েই আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল।

"এবার তো মনে হচ্ছে পুলিশে খবর দিতে হবে," সুধাংশু বললেন, "বন্ধ শেষ করে সঞ্জয়দা ফিরে আসুক।"

"বন্ধ কীরকম হচ্ছে কে জানে! একবার বাইরে গিয়ে দেখে এলে

হত।" অভ্র সাজেস্ট করলেন। ছেলেমেয়েরা হইহই করে উঠল, "হ্যাঁ, চলো চলো!"

সুনন্দা আর সবিতা একটা ক্ষীণ আপত্তি জানাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কেউ পাত্তা দিল না। সকলে চলল গেটের দিকে। পূষণ বলল, ও যাবে না। বন্‌ধ দেখতে ইচ্ছে করছে না।

ওরা বেরিয়ে যেতেই পূষণ আবার ফিরে এল ঝোপটার কাছে। গর্তটা থেকে ঘটগুলো আবার বের করে নেড়েচেড়ে দেখল। মাথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত টিকটিক করছে। এরকম ও আগেও দেখেছে। কোথায় দেখেছে মনে পড়ছে না। এগুলো নিছক ঘট নয়। জোড়ায়-জোড়ায় সাজানো ছিল, একটা পুরুষ, একটা নারী। ও মেয়ে ঘটটা তুলে নেড়েচেড়ে দেখে, পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছে, তখনই পাশ থেকে কেউ বলে উঠল, "কী করছ?"

চমকে তাকিয়ে পূষণ দেখল, রিয়া পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। পূষণ বলল, "তুই যাসনি?"

"গেলাম তো! কিন্তু তোমার জন্যে মন কেমন করছিল, তাই চলে এলাম।"

"তাই? আমার কী সৌভাগ্য! আয় তা হলে দু'জনে গল্প করি।"

রিয়ার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে! বলে দেবে এখন কথাটা? কবে থেকে বলি-বলি করেও বলা হচ্ছে না! পূষণের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘটটা দ্যাখো। কী রকম ব্রেস্টের মতো!" রিয়া হেসে কুটিপাটি।

পূষণ হাসল, "ব্রেস্টের মতো নয়, ওটা তাই-ই। সেজন্যই ওই ছ'টা মেয়ে ঘট আর এই ছ'টা পুরুষ!"

"ধ্যাত!" রিয়া অবিশ্বাসে ঠোঁট বেঁকাল।

"সিরিয়াসলি। এগুলোর একটা অর্থ আছে। আমি পড়েছিলাম, মনে পড়ছে না। এগুলো কোনও রিচুয়ালের সঙ্গে রিলেটেড। কিন্তু এসব রিচুয়াল কারা করছে?"

রিয়া হাত বাড়িয়ে বলল, "দ্যাখো, তোমার জন্যে কী রেখেছি।"

একটা বাংলা চার সংখ্যার মতো দেখতে জিনিস। সংখ্যাটার উপর-নীচে আর আড়াআড়ি দু'খানা দু'মুখো তির বেরিয়েছে। এ ছাড়াও কোনাকুনি আরও দুটো দু'মুখো তির। অর্থাৎ চার সংখ্যাটাকে

মাঝখানে রেখে মোট আটটা তির। কীসের তৈরি কে জানে! টুকটুকে লাল রং।

"কোথায় পেলি?"

"মাটিতে পড়ে ছিল," রিয়া বলল, "তখনই তোমাকে দ্যাখাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তোমার বউ যা চেঁচাচ্ছিল! এটা দেখলে নিতে দিত না। তোমাকে আলাদা করে এটা দেব বলেই আমি ফিরে এসেছি।"

জিনিসটা পকেটে রাখতে-রাখতে পূষণ বলল, "থ্যাঙ্কস।"

দুপুরবেলা গৌরীকান্তের ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে মিত্রা আর পূষণের মুখে কথা ফুটল না। ঘরের ঠিক মাঝখানে যে পালঙ্কটা রয়েছে, তার উপর অনায়াসে ফুটবল খেলা যায়। পুরনো ড্রেসিং টেব্‌ল, আয়না সব পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। এত বছরে ধুলো তো পড়বেই, পড়েওছে। কিন্তু মনে হয়, আসবাবগুলো মাঝে পরিষ্কার করা হয়েছিল।

একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে কালো-কালো তোরঙ্গ। একটার উপর একটা। দু'জনে ধরাধরি করে একটা তোরঙ্গ নামাল। এতদিন ধরে বন্ধ রয়েছে, তালা খুলতেই চায় না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সেটা খুলল। ভিতর থেকে একরাশ পুরনো বিলবই বেরোল। দু'-একবার নাড়াচাড়া করে পূষণ রেখে দিল।

মিত্রা বলল, "ভাল করে দেখলে না? দাদু যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, সেই আমলের মাইনের রসিদ! সালটা দ্যাখো, ১৯২০। এই দ্যাখো, দেখেছ?"

ততক্ষণে পূষণ একটা রুল টানা খাতা বের করেছে। বিজ্ঞানের ক্লাসওয়ার্কের খাতা। ইন্দুশেখরের উত্তরের পাশে-পাশে টিক দেওয়া রয়েছে। দু'-একটা জায়গায় ঢ্যাড়াও দেওয়া রয়েছে। নীচে জগদানন্দ রায়ের সই।

মিত্রার হাতে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড উঠে এসেছে। ইন্দুশেখরকে তার বাবা গৌরীকান্ত মন দিয়ে পড়াশোনা করার কথা বলছেন। বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে নিজের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, মানুষের জীবন অনিত্য, একমাত্র জগদীশ্বর সহায়। এই জেনে ছাত্র ইন্দুশেখর যেন নিজের কাজ করে যায়।

"ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এই চিঠিটা পড়ো," বলে পোস্টকার্ডটা পূষণের দিকে বাড়িয়ে দিল মিত্রা।

পূষণ পড়ে বলল, "১৯২৪! ইন্দুশেখরের বয়স কত তখন?"

"দশ-বারো হবে। ভাবো, একটা বাচ্চা ছেলেকে কী সব উপদেশ দিচ্ছে!"

পূষণ ততক্ষণে দ্বিতীয় তোরঙ্গটা খুলে ফেলেছে। তার ভিতরে একটা বাঁধানো খাতা। ও উলটেপালটে দেখে বলল, "খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়েছি, গৌরীকান্তের ডায়েরি।"

ডায়েরিটা পাশে রেখে, তোরঙ্গটা ঘাঁটতে শুরু করল পূষণ। সেরকম কিছু বেরোল না। কিছু ছেঁড়া পাতা, তাতে কীসব মন্ত্র লেখা। একটা ক্ষুর, দুটো পালক, তিনটে ছোট-ছোট পাথর, একটা কীসের দাঁত। পেনসিলে আঁকা এক মহিলার ছবি যার কোনও পরিচয় দেওয়া নেই। আর একটা পুরনো লালচে হয়ে যাওয়া ছবি। ছ'জন লোক বসে আছেন।

একদম নীচ থেকে একটা অদ্ভুতদর্শন মূর্তি বেরোল। একটা সিংহ, তার উপরে একটা চিল, তার উপরে আবার একটা বিষ্ণুমূর্তি। সেই বিষ্ণুমূর্তির উপরে আর-একটা ষড়ভুজ মূর্তি। বাঁ দিকে একটা হাতে মালা, একটাতে কমণ্ডলু, অন্য হাতে লাঠি। ডানদিকের একটা হাতে বরাভয় মুদ্রা, আর-একটাতে একটা চ্যাপটা-চৌকো মতো জিনিস। অন্য হাতে পদ্মফুল। পদ্মের উপর আবার একটা বই রাখা আছে।

"ওয়াও!" পূষণ লাফিয়ে উঠল।

"দেখি দেখি," বলে মূর্তিটা হাতে নিয়ে মিত্রা বলল, "হেভি দেখতে তো! কীসের মূর্তি এটা?"

"হুঁ হুঁ বাবা, এটা তোমার ফান্ডায় কুলোবে না," পূষণ হাসছে, "এটা খুব রেয়ার একটা মূর্তি! কল্লোলের কাছে এক পিস আছে।"

"কল্লোলের নিকুচি করেছে। কীসের মূর্তি বলবে তো!"

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

"মে আই কাম ইন?" দরজার ফাঁক দিয়ে রিয়ার মুখ দেখা গেল।

"ইয়ারকি হচ্ছে?" মিত্রা বলল, "আয়।"

পূষণের দিকে তাকিয়ে রিয়া হাসল, "আরিব্বাস! এটা কী গুরু?"

"তোর পূষণদা বের করেছে। কীসের মূর্তি বলছে না।"

পূষণ মুচকি-মুচকি হাসছে, "বলব, সব বলব। সবুর করো।"

"কিছু ধুলো ঘাঁটতে পারো তোমরা, ইসস্!" রিয়া নাক কুঁচকোল।

ইতিমধ্যে আর-একটা তোরঙ্গ থেকে বেশ কিছু রসিদ বই, গোটা তিনেক বর্ণপরিচয় এবং সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলের একটা প্রথম সংস্করণ বেরোল।

পূষণ বইটা পাশে সরিয়ে বলল, "এটা কিন্তু রেয়ার জিনিস। আবোলতাবোলের ফার্স্ট এডিশন!"

ডায়েরি, খাতা, পোস্টকার্ড, মূর্তি নিয়ে ওরা তোরঙ্গগুলোকে আবার যথাস্থানে রেখে, ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে এল। ঘরে ঢুকতেই রিয়া আর মিত্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল, "বলো, ওটা কীসের মূর্তি!"

"বলছি, বলছি, আগে ঠিক করে গুছিয়ে বসি," বলে পূষণ আরাম করে বসল, "এর নাম হরি-হরি- হরি বাহনোদ্ভব।"

রিয়া হঠাৎ কেশে উঠল। মিত্রা বলল, "একটু আস্তে-আস্তে বলো। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।"

"হরি-হরি-হরি-বাহনোদ্ভব।"

"বানিয়ে বলছ না তো?"

"সিরিয়াসলি, মূর্তিটার নাম ওটাই। সংস্কৃতে হরি মানে সিংহ, হরি মানে গরুড়, হরি মানে বিষ্ণু। দ্যাখো, একদম নীচে সিংহ, তার উপর গরুড়, তার উপর বিষ্ণু এবং এই তিন বাহনের উপরে যে দাঁড়িয়ে আছে, সেই হল হরি-হরি-হরি বাহনোদ্ভব। ক্লিয়ার?"

"না ক্লিয়ার নয়," রিয়া বলল, "বিষ্ণুর উপর যে রয়েছে, সে কে?"

"ওর নাম অবলোকিতেশ্বর। নাম শুনেছিস?"

মিত্রা আর রিয়া দু'জনেই মাথা নাড়ল। কেউই নামটা শোনেনি।

পূষণ বলল, "বৌদ্ধধর্মের দুটো ভাগ জানিস তো, হীনযান আর মহাযান? সেই মহাযানের কনসেপ্ট হল, পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ আছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই একজন স্ত্রী আছেন। সেই পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে একজন হলেন অমিতাভ। এঁর স্ত্রীর নাম পাণ্ডরা। তাঁদের ছেলে এই অবলোকিতেশ্বর। ইনি হচ্ছেন বোধিসত্ত্ব। ধর বুদ্ধের আগের স্টেজ।"

"বুঝলাম," রিয়া বলল, "বেশ তালেবর ছেলে তো, তিনটে বাহনে চেপে ঘোরে!"

"অ্যাকচুয়ালি অবলোকিতেশ্বরের প্রায় একশো আট রকমের মূর্তি হয়। এটা তার মধ্যে একটা।" পূষণ বলল।

"ঢপ মেরো না তো! একশো আটটা মূর্তি? তুমি সবগুলো চেনো?"

"এটা ছাড়া আর-একটাও চিনি না! এটা চিনি স্রেফ ওই অদ্ভুত নাম আর বাহনের জন্য," বলে পূষণ রিয়াকে বলল, "আমার বন্ধু কল্লোলকে তো তুই দেখেছিস। ওর কাছেই এই মূর্তিটা দেখেছি। এরকমই মূর্তি ও নেপাল থেকে এনেছিল।"

"ঠিক আছে। পাঁচটা ধ্যানী বুদ্ধের একজন তো ওই অবলোকেশ্বর না কী, " মিত্রা জিজ্ঞেস করল, "বাকি চারটে কে?"

"অবলোকেশ্বর না, অবলোকিতেশ্বর," পূষণ শুধরে দিল, "সে কিন্তু ধ্যানী বুদ্ধ নয়, বোধিসত্ত্ব। ওই পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ হলেন, অমিতাভ, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি আর... দাঁড়াও বলছি," পূষণ বিড়বিড় করে নামগুলো আওড়াতে শুরু করল।

রিয়া হাসছে। পূষণ বিড়বিড় করে বলছে, "অমিতাভ, রত্নসম্ভব, তারপর... তারপর হল অমোঘসিদ্ধি। আরে, জাস্ট মিস করে যাচ্ছি!"

"ওকে, মেনে নিচ্ছি, তুমি অনেক জানো," রিয়া পা নাচাতে-নাচাতে বলল।

পূষণ বলল, "অমিতাভ, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি আর.. আর.. মনে পড়েছে, অক্ষোভ্য আর বৈরোচন! মহাযানের পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধ! হীনযানে এসব নেই!"

মিত্রা বলল, "কল্লোলের পাল্লায় পড়ে তোমারও সেই এক রোগ ধরেছে। চান্স পেলেই ফান্ডা দেখানো!"

"আমি তো বলতে চাইনি। তোমরাই শুনতে চাইলে!"

সন্ধেবেলা বারান্দায় চা খেতে-খেতে সকলে গল্প করছিল। মূর্তিটা হাতে-হাতে ঘুরছে। পূষণকে ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা কয়েকবার ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।

সুধাংশু বললেন, "এই মূর্তিটা দাদু কোথা থেকে জোগাড় করেছিল, ভাবো তো!"

সবিতা বললেন, "বলেছিলাম না, আগে এই বাড়িতে তন্ত্রের চর্চা হত!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ," পূষণ আগ্রহী হয়ে উঠল, "কে করতেন?"

"প্রায় সকলেই! দাদুর আমলেই বোধহয় শেষ। বাবার আমল থেকে ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়। আসলে বাবা শান্তিনিকেতন থেকে একদম নতুন ভাব নিয়ে এসেছিলেন তো!"

সেই সময় সঞ্জয় ফিরলেন, "কী খবর তোমাদের?"

"এই তো," অভ্র বললেন, "আপনার বন্‌ধ তো দারুণ হয়েছে। আমরা সকালে হেঁটে দেখতে বেরিয়েছিলাম।"

"ওই আর কী, সঞ্জয়ের ক্লান্ত মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল। বললেন, "আবার তো মেরেছে!"

"মানে? আবার খুন?" মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

"জঙ্গিরাই হবে। জঙ্গলের ধারে পড়ে ছিল। মেল বডি, মাথাটা নেই।"

"সে কী! কখন?"

"কখন মেরেছে বলা যাচ্ছে না। বেলার দিকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।"

"কী যে হচ্ছে! ভাল্লাগে না,' সুনন্দা বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "এদিকে ওরা আজ আবার ঢুকেছিল।"

"কে?" সঞ্জয় জিজ্ঞেস করলেন।

দিয়া পুরো গল্পটা বলল। এমনকী ঝোপের আড়ালে গর্ত আর ঘটির কথাও বাদ দিল না।

শুনতে-শুনতে সঞ্জয়ের মুখের ভঙ্গি পালটে যাচ্ছিল। বললেন, "বুঝতে পারছি, কেউ পিছনে লেগেছে। কিন্তু কেন? কী আছে এখানে? যা বলছ, তার থেকে পরিষ্কার কেউ তুকতাক করার চেষ্টা করছে।"

"আপনি তুক মানেন?" সুনীল জিজ্ঞেস করলেন।

"দ্যাখো, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। এই জায়গাটা এমনই যে, লোকজন ডাকিনী-যোগিনী, তুকতাক, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস

করে। শোনা যায়, ইন্টিরিয়রে নাকি কাপালিক আছে, লুকিয়ে-চুরিয়ে নরবলি হয়। ধরো, ওই যে মেয়েটার মাথা কেটে খুন করেছে, সেটাকে কী বলবে?"

সকলে চুপ করে রইল। তারপর সবিতা বললেন, "নরবলির কথা তো আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। আগে তো শুনেছি, এখানে প্রচুর কাপালিক থাকত।"

"হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। তবে এখনও খোঁজ পাইনি।" সঞ্জয় বললেন।

মিত্রা জিজ্ঞেস করল, "পিসি তুমি যে বলছিলে, আমাদের বাড়িতে আগে তন্ত্রের চর্চা হত। তা সেখানেও কি নরবলি হত?"

"জানি না," সবিতা বললেন, "দাদুর পর থেকে সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে কী হত, কী করে জ'নব?"

"তোমাদের বাড়িতে তন্ত্রের চর্চা হত? ভেরি ইন্টারেস্টিং," সঞ্জয় বললেন, "শুনি একটু! এই বাড়িতেই হত?"

"শোনার মতো কিছু নেই," মৃগাঙ্ক বললেন, "আমরা নিজেরাই ভাল জানি না!" ঠাকুরমাদের মুখে, পিসিদের মুখে যা শুনেছি।"

"সেটাই শুনি।" সঞ্জয় বললেন।

মৃগাঙ্ক বললেন, "আমাদের কোন পূর্বপুরুষকে নাকি এক তান্ত্রিক একটা জিনিস দিয়েছিলেন। সেটা নাকি বাড়িতে রাখলে মঙ্গল হয়। সেটার নিয়মিত পুজো হত। আমাদের পরিবারে প্রত্যেক জেনারেশনেই নাকি একজন সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বাড়িতে নাকি আগে ভৈরবী-টৈরবি নিয়ে চর্চা হত। এই যা! সে জিনিস কোথায় গিয়েছে কে জানে! দাদু মারা যাওয়ার সময়ই জিনিসটা হারিয়ে যায়।" মৃগাঙ্ক থামলেন।

"জিনিসটা কী ছিল? আই মিন, ওই তান্ত্রিক কী দিয়েছিলেন?" সঞ্জয় জিজ্ঞেস করলেন।

"কী করে বলব? আমরা কি চোখে দেখেছি নাকি?" মৃগাঙ্ক বললেন, "আমাদের ছোটবেলায় ঠাকুরমা মাঝেমধ্যে ওটার কথা বলতেন। তখন অবশ্য ঠাকুরমার বয়স হয়ে গিয়েছে। কী বলতেন, তার ঠিক নেই।"

"রাজীববাবু শুনলে খুব ইন্টারেস্ট পাবেন।" সঞ্জয় বললেন।

"রাজীববাবুর কী খবর? কেমন আছেন উনি?" মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

"আছেন ভালই," সঞ্জয় বললেন, "আমার সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয়নি। উনি জানেন না তোমরা এসেছ। জানলে ঠিক চলে আসবেন।"

পূষণের দিকে ফিরে অভ্র বললেন,"রাজীবদার সঙ্গে আলাপ হলে তোমার ভাল লাগবে। ভদ্রলোক আদতে শিলিগুড়ির লোক। এখানে কলেজে পড়াতেন। রিটায়ার করে এখানেই থেকে গিয়েছেন। ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন, বিশেষত বুদ্ধিজ়ম-এ অথরিটি। বইটইও আছে।"

"তা ছাড়া ফোক কালচার, বিভিন্ন রিলিজিয়াস কাল্টে ভীষণ ইন্টারেস্টেড। উনি তোমাদের ফ্যামিলির কথা শুনলে তো লাফিয়ে উঠবেন!" সঞ্জয় বললেন।

মৃগাঙ্ক বললেন, "তা হলে ওঁকে হতাশ হতে হবে। যা আপনাকে বললাম, তার বাইরে কিছুই পাবেন না। ইন ফ্যাক্ট আমার ধারণা, কিছুই ছিল না। দাদুর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ঠাকুরমা মারাত্মক শক পেয়েছিলেন। এসবই ঠাকুরমার কল্পনা। তা ছাড়া আমরা যখন গল্পটা শুনেছি, তখন ওঁর অনেক বয়স।"

"দাদুর অস্বাভাবিক মৃত্যু মানে?" অনি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছিল ওঁর?"

মৃগাঙ্ক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "দাদু খুন হয়েছিলেন!"

"খুন?" পূষণ চমকে উঠেছে।

"ইয়েস। ঠাকুরমা বলতেন, তান্ত্রিক যেটা দিয়েছিলেন সেটা নেওয়ার জন্যে কাপালিকরা পিছনে লেগেছিল। ওরাই দাদুকে খুন করে।"

সকলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সঞ্জয়বাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "কোথায় ঘটেছিল? মানে খুনটা কোথায়..."

মৃগাঙ্ক বললেন, "এই বাড়িতেই। ঠাকুরমা বা পিসিদের মুখে শুনেছি, তার আগের দিন অমাবস্যা ছিল। দাদু সারারাত পুজোর ঘরে ছিলেন। তার কিছুদিন আগে থেকেই নাকি বাড়িতে নানারকম লোক আসত। দাদুর কাছে কিছু চাইত। ভোরবেলা মানে অমাবস্যা

ছাড়ার পর উনি পুজোর ঘর থেকে বাইরে বেরোতেই, তিনজন লোক ওঁকে ঘিরে ধরে ছুরি চালিয়েছিল। দাদু একটা শব্দও করতে পারেননি। ওখানেই পড়ে গিয়েছিলেন।"

মৃগাঙ্ক পূষণের দিকে ফিরলেন, "দাদুর বয়স তখন চল্লিশ। বাবা বছর দশেকের, শান্তিনিকেতনে পড়ছেন। পিসিরা আরও ছোট। ঠাকুমার বয়স উনত্রিশ।"

রিয়া শিউরে উঠল। বারান্দার সামনে বসে ডোম্বিও শুনছিল। খুনের কথা শুনে ও একটা অস্ফুট শব্দ করল।

পূষণ জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুরঘর থেকে বেরোতেই লোকগুলো ঘিরে ধরেছিল? ওরা বাড়ির ভিতরে ঢুকল কী করে?"

"বাড়ির ভিতরে ঢোকেনি তো!" সুধাংশু বললেন, "ওহো, তোমাকে বলা হয়নি! ওই যে ঠাকুরঘরটা এখন দেখছ, ওটা ছিল ঠাকুরমার। পুজোর ঘর আর-একটা ছিল, বাইরে। ওই যেখানে ছোট-ছোট ঘরগুলো দেখছ, তার পিছনেই। দুটো বড় ছাতিমগাছও ছিল। তার ঠিক মাঝখানে দাদু একদম আলাদা একটা ঘর তৈরি করিয়েছিলেন।"

"সেটা এখন কোথায়?"

"ভেঙে গিয়েছিল। তারপর যা হয়, লোকে ইট খুলে নিয়ে গিয়েছে। দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে ওই ঘরে ভয়ে কেউ ঢুকত না।"

"তাই? কিন্তু ওদিকে তো এখন আর কিছুই নেই।" দিয়া বলল।

"সে তো হবেই," অভ্র বললেন, "প্রায় চুরাশি-পঁচাশি বছর আগের কথা। ছাতিমগাছ কি অ্যাদ্দিন বাঁচে? জানি না।"

"হয়তো ওই ঘটনার পরই ঠাকুরমা কাটিয়ে দিয়েছিলেন।" সবিতা বললেন।

"কী করে হবে?" মিত্রা বলল, "এই আবহাওয়ায় ছাতিমগাছ হতে পারে? বাইরে থেকে এনে লাগালেও তো বাঁচবে না।"

"কী করে জানব?" মৃগাঙ্ক বললেন, "ঠাকুরমা যা বলতেন, তাই বলছি।"

"আর ওই মাটির নীচের ঘর?" পূষণের মুখে মিটিমিটি হাসি।

"বলতে পারব না। আমরা কখনও চোখে দেখিনি। শুধু ঠাকুরমার মুখেই শুনেছি। সত্যি-সত্যি ছিল কি না, কে জানে? তবে থাকলেও

এখন কিছুই পাওয়া যাবে না। এত দিনে সব বুজে গিয়েছে। কতবার ধস নেমেছে, কখনও থাকে নাকি?" সুধাংশু বললেন।

পূষণ বলল, "এই শহরটা তো পাহাড়ের গায়ে। মাটির নীচে ঘর করলেও সেটা পাহাড়ের গা বেয়েই নামবে।"

"এগজ্যাক্টলি," মৃগাঙ্ক বললেন, "ঠাকুরমা বুড়ো বয়সে কী বলেছেন না বলেছেন, তার ঠিক আছে?"

"আমি আজই রাজীবের খোঁজ নিচ্ছি। তোমরা এসেছ শুনলে ও নিশ্চয়ই আসবে," বলতে-বলতে সঞ্জয় সেলফোনটা তুলে ডায়াল করতে শুরু করলেন।

॥ ৬ ॥

গতকাল সারাদিন কেটেছে বন্‌ধ নিয়ে, এখন বিকেল। আজ পার্টির লোকজন আসবে বাড়িটার ব্যাপারে কথা বলতে। সঞ্জয়বাবুর মুখ থেকে শোনার পরই মৃগাঙ্করা বাড়িটা নিয়ে কী করবেন চিন্তা করছিলেন। এখানে এসে স্বচক্ষে সব দেখার পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন।

বাড়ি নিয়ে বৈষয়িক আলোচনায় ছোটরা থাকবে না, তাই মিত্রারা কালিম্পং-এর বাজারে ঘুরছিল। রংবেরঙের তিব্বতি তংখা, চায়ের কাপ, ভোজালি আর ফুলদানি নিয়ে চারপাশটা ঝলমল করছে। ওরা দোকানে ঘুরে-ঘুরে জিনিসগুলো দেখছিল। হঠাৎ মিত্রা বলল, "অ্যাই, এই অ্যাডটা দ্যাখো।"

পূষণ তাকিয়ে দেখল, সামনেই একটা কাচের দরজাওয়ালা ঘর। তার সামনে একটা বড় বোর্ডে জঙ্গলের ছবি টাঙানো রয়েছে। নীচে লেখা নেওরা ন্যাশনাল পার্ক।

"গেলে হত।" মিত্রা নিজের মনেই বলল।

পূষণ বলল, "সঞ্জয়জেঠুই তো বাগড়া দেবে।"

"আমার লোকটাকে একটুও ভাল লাগেনি," রিয়া বলল, "বাজে টাইপের লোক।"

দিয়া একটা ছোট্ট বটুয়া দোলাতে-দোলাতে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। সুন্দর দেখতে জিনিসটা।

"তোমাদের খিদে পায়নি?"

সকলেরই খিদে পেয়েছে। হইচই করতে-করতে সবাই কালিম্পং বেকারিতে ঢুকল। রিয়া বলল, "কাল কী করা হবে, এখনও ঠিক হয়নি কিন্তু।"

"কী আবার হবে, সকলে মিলে বেরোব," মিত্রা বলল, "সঞ্জয়জেঠুকে বলে একটা গাড়ি ঠিক করতে হবে।" ওরা মেতে উঠল পরের দিনের পরিকল্পনায়।

পূষণ কোনও কথা বলছিল না। ওই ডায়েরিটা ওকে ভীষণ টানছিল। কাল রাতে ডায়েরিটা সামান্য পড়ে পূষণের মনে হয়েছে, গৌরীকান্ত একটা রহস্যময় ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু সেটা কী?

বাড়ির গেট খুলে ঢুকতেই দিয়া বলল, "কী বিশ্রী একটা গন্ধ আসছে না?"

সবাই জোরে নিশ্বাস টানল। ঠিকই, একটা বাজে গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। পূষণ জোরে নিশ্বাস নিয়ে গন্ধটা বোঝার চেষ্টা করছিল। বারান্দার কাছে এসে বলল, "তোমরা যাও, আমি একটু দেখে আসি!"

"কোথায় যাচ্ছ তুমি?" তীক্ষ্ণ গলায় মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"কোথাও না, জাস্ট দেখছি গন্ধটা কীসের," পূষণ মুচকি হেসে বলল, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

কিঙ্কর আর অনি অ্যাডভেঞ্চারের আভাস পেয়ে লাফিয়ে উঠল, "চলো পূষণদা, ব্যাপারটা দেখে আসা দরকার!"

গন্ধটা ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। মনে হল, উত্তরদিক থেকে আসছে। ওরা সেদিকে ফিরে যেই একটু-একটু করে এগোতে থাকল, গন্ধটার প্রকৃতিও পালটে গেল। প্রথমে যেটাকে বিশ্রী বলে মনে হচ্ছিল, সেটা ক্রমশ পালটে গিয়ে হাওয়ায় একটা হালকা সুগন্ধ ভাসতে শুরু করল। কিঙ্কর বলল, "মনে হচ্ছে ধুনো।"

দিয়া নিশ্বাস নিয়ে বলল, "কী বলছিস? পরিষ্কার ছাতিমফুলের গন্ধ!"

"দিয়া ঠিক বলছে, ছাতিম বলেই মনে হচ্ছে," মিত্রা দাঁড়িয়ে পড়ে

বলল, " কিন্তু বাগানে তো কোনও ছাতিমগাছ নেই! সেই ছাতিমগাছটা কি আবার ফিরে এল?" মিত্রার গলায় ঠাট্টার সুর।

"ওরে বাবা, আমি নেই!" মিত্রার কথা শুনে রিয়া পূষণকে আঁকড়ে ধরল।

কিঙ্কর বলল, "একটা আওয়াজ হচ্ছে না! কীসের বলো তো?"

কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনতে পেলেও ঠিক বোঝা গেল না কীসের শব্দ।

এক-একবার মনে হচ্ছে দূরে কোথাও বাঁশি বাজছে, তারপরই মনে হচ্ছে সেতার। কিন্তু কোথায় বাজছে? ওরা শব্দটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছিল, এমন সময় "ওটা কী রে?" বলে দিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

সূর্য ডুবে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্ধকার সেভাবে নামেনি। যেটুকু আলো রয়েছে তাতে ওরা দেখল, একটা কালো মতো কিছু মাটির উপর দিয়ে ঘষটে-ঘষটে সামনের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

"অনি যাস না, সাপটাপ থাকতে পারে।" পূষণ চেঁচিয়ে উঠল।

"সাপ নয়, ওটা অন্য কিছু" বলতে-বলতে অনি একটা ভাঙা ডাল তুলে নিল ঝোপ ঠ্যাঙাবে বলে।

"অনি!" মিত্রা চেঁচিয়ে উঠেছে, "সরে আয় শিগ্‌গির! কেন যাচ্ছিস ওদিকে?"

ধমক খেয়ে অনি চলে আসছিল, কিঙ্কর বলল, "ওই যে বেরিয়েছে!"

কালো প্রাণীটাকে ওরা একঝলক দেখতে পেল। সেই ঝোপ ছেড়ে আর-একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

"দেখলি ওটা সাপ নয়, ক্রল করছে না," অনি বলল, "কীরকম ডিগবাজি খেতে-খেতে গেল!"

রিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে পূষণের হাত আঁকড়ে ধরল, "চলো, ঘরে চলো!"

দিয়া আর্তনাদ করে উঠল, "ওই যে আবার বেরিয়েছে!"

সকলে দৌড়োল সিঁড়ির দিকে। কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে তাকাল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে, প্রাণীটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে দুলছে। মিত্রা বলল, "দেখেছিস, ওটা সাপ।"

"তোমরা সিঁড়িতে উঠে যাও," বলে অনি নিচু হয়ে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে কালো প্রাণীটার দিকে ছুড়ে মারল। ইটটা গায়ে লাগতেই ওটা মাটিতে পড়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই একটা বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল। আওয়াজটা এতটা জোরে এল যে, ওরা সকলেই চমকে উঠল।

আবার একটা ভয়ানক আর্তনাদ করে প্রাণীটা গড়িয়ে-গড়িয়ে ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল। ওদের প্রত্যেকের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। সকলে কোনওরকমে মিত্রাদের ঘরে এসে ঢুকল।

"ওটা কী ছিল পূষণদা?" কিঙ্কর জিজ্ঞেস করল।

পূষণ মাথা নাড়ল।

"কীরকম বিকট চিৎকার করল!"

রিয়া বলার চেষ্টা করল, "বেড়ালছানা নয় তো?" কিন্তু ওর নিজের কাছেই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল না।

মিত্রা অনিকে বলল, "তুই দুম করে ইট ছুড়তে গেলি কেন?"

অনি উত্তর দেওয়ার আগেই দড়াম করে বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে গেল হাওয়ায় আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিশ্রী গন্ধটা ঘরে ঢুকে এল।

রিয়া শক্ত করে পূষণের হাত চেপে ধরল। পূষণ ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

"আবার যদি খুলে যায়? কাঁপা গলায় অনি বলল, "ওটা যদি ঢুকে আসে?"

"বাজে বকিস না তো," পূষণ সাহস দেওয়ার চেষ্টা করল, "তোকে তাড়া করে আসতে যাবে কেন? ওটা হয়তো বেজিফেজি ছিল।"

"কিন্তু ওই চিৎকারটা?" দিয়া বলল, "বেজি কি অত জোরে ডাকতে পারে?"

কারও কাছেই এর কোনও ব্যাখা নেই। রিয়া বলল, "মা-দের বলবি না?"

"খবরদার না!" কিঙ্কর বলল, "বললে ওরা আরও ভয় পাবে। এমনিতেই কাপালিক আর জঙ্গি নিয়ে ঘাবড়ে আছে, মাঝখান থেকে আমাদের বেড়াতে যাওয়াটা ভেস্তে যাবে।"

"কাল কি যাওয়া হচ্ছে?" রিয়া বলল।

"নিশ্চয়ই হচ্ছে। বড়রা না যায়, না যাবে। আমরা যাবই। কী বলিস মিত্রাদি'?" কিঙ্কর বলল।

॥ ৭ ॥

ডিনারের পর পূষণ ডায়েরিটা নিয়ে, বালিশে হেলান দিয়ে বসল। মিত্রা চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিজ্ঞেস করল, "কী পড়ছ এত মন দিয়ে?"

"গৌরীকান্তের ডায়েরি। পড়তে শুরু করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

"তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর গিফ্‌টের হদিশ পেলে?"

"না। ডায়েরিটা ঠিক দিনলিপি নয়। যখন যেরকম মনে হয়েছে, উনি লিখেছেন, ছবিও এঁকেছেন।"

"ছবি?" মিত্রার চুল বাঁধা হয়ে গিয়েছে, "দাঁড়াও, বাথরুম থেকে আসছি।"

খাটে উঠে মিত্রা ডায়েরির উপর ঝুঁকে পড়ল। পরপর কতগুলো রঙিন বৃত্ত আঁকা রয়েছে। তার মধ্যে খুদে-খুদে অক্ষরে ল, ব, র, য, হ লেখা রয়েছে আর মাঝখান দিয়ে একটা তিরের মতো কিছু এঁকেবেঁকে উপরে উঠে গিয়েছে।

"কী বলো তো এটা?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"খুব সম্ভব 'হ য ব র ল'-র ইলাস্ট্রেশন," মিত্রা বলল, "উনি হয়তো হ য ব র ল-র মলাটের চিন্তা করেছিলেন।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। হ য ব র ল কথাটা তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে, আর এরকম রংবেরঙের ডিজ়াইন..."

"হ য ব র ল ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে।"

"সো? গৌরীকান্ত মারা গিয়েছেন ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ। উনি নিজের মতো করে ইলাস্ট্রেশন করতে পারেন না? ফার্স্ট এডিশনের আবোলতাবোলও তো দেখলে রয়েছে। উনি হয়তো নিজের মতো করে ডিজ়াইনটা করেছিলেন। পারেন না?"

"নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু এটা অন্য জিনিস।"

"কী?"

"ক'দিন ধরেই তান্ত্রিক কাপালিক নিয়ে নানা কথা শুনেছ। এটা তার সঙ্গে রিলেটেড।"

"তাই? কীরকম?"

"খুব ভাল করে দ্যাখো, ওগুলো হ য ব র ল নয়, কী সেটা ভাল করে দ্যাখো।"

মিত্রা ডায়েরিটা চোখের কাছে নিয়ে এসে দেখল, প্রত্যেকটা অক্ষরের পাশে একটা করে অনুস্বর রয়েছে, লং বং রং যং। ও পূষণের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছি।"

"আমাদের শরীরে সাতটা চক্র আছে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ইত্যাদি, ইত্যাদি। সবচেয়ে নীচে মূলাধার আর সবচেয়ে উপরে সহস্রার। প্রত্যেকটা চক্রের মধ্যে একটা করে বীজমন্ত্র আছে। এগুলো হল সেই মন্ত্র।"

"আচ্ছা! তারপর?"

"কুণ্ডলিনী বলে কোনও শব্দ শুনেছ?"

"ইয়েস। সাধুরা এই কুণ্ডলিনী জাগানোর চেষ্টা করে, তাই না?"

"হুম। এই কুণ্ডলিনী সাপের মতো গুটিয়ে মূলাধারের ভিতরে বসে আছে। সাধনা করলে সে আস্তে-আস্তে উপরে উঠে শেষে সহস্রারে মিশে যায়। সহস্রারে গেলে ব্রহ্মদর্শন, অমৃতলাভ যাই বলো, সব হয়। এই বৃত্ত আর লং বং এঁকে উনি চক্রগুলো বুঝিয়েছেন।"

মিত্রা মাথা নাড়ল, "তার মানে ওই আঁকাবাঁকা তিরটা কুণ্ডলিনী?"

"হ্যাঁ," পূষণ বলল, "সহস্রার সবচেয়ে উপরে। সেখানে নাকি হাজার পাপড়িওয়ালা একটা পদ্মফুল আছে। তিরের মুখটা দ্যাখো, ছড়ানো ফুলের মতো।"

"তুমি ঠিক বলছ তো?"

"আরে," পূষণ অবাক, "ফালতু ঢপ মারতে যাব কেন? আমি বইপত্র ঘেঁটেছি। ইন ফ্যাক্ট কল্লোলই এই বিষয়ে আমার ইন্টারেস্ট গ্রো করিয়েছে।"

মিত্রা আবার ছবিটা দেখল। তারপর বলল, "হঠাৎ এটা কেন আঁকলেন? কিছু লিখেছে কোথাও?"

"না," পূষণ ঘাড় নাড়ল, "থাকলেও বোঝা যাচ্ছে না। যেমন এটা পড়ো,"

কমলে কুলিশ হেরি ভাতিল শ্রীমুখ/ বিবাদী বা বাদী ছাড়া ব্রাহ্মী বিমুখ/ আখরে আদরে জাগে অজা বোধীসুখ।

"এটা কি বাংলা? সোজা কথা সোজাভাবে বলতে অসুবিধে কোথায়?" মিত্রা বলল।

"অসুবিধে নিশ্চয়ই ছিল। ওঁর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। উনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিছু ঘটতে চলেছে। ছেলেকে লেখা চিঠিটা খেয়াল করো।"

"বুঝেছি। কিন্তু এর মানে কী?"

পূষণ উত্তরে হাসল। "সংক্ষেপে বলতে গেলে হিং টিং ছট। আর-একটা জিনিস দ্যাখাচ্ছি। ডায়েরিটা দাও," মিত্রার কাছ থেকে ডায়েরিটা নিয়ে পূষণ পাতা উলটে বলল, "দ্যাখো।"

ডায়েরিটা নিয়ে মিত্রা পাতাটা দেখল। বাঁ দিকে তারিখ রয়েছে, ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৪। ডানদিকের পাতায় লেখা রয়েছে,

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো।
লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি?
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
জীবনে যত পূজা হল না সারা।
ঘরে তখন রাখবে কে আর ধরে
আমার ঘরে তোমায় আমি একা রেখে দিলাম স্বামী
আমার এ ঘর বহু যতন করে ধুতে হবে, মুছতে হবে মোরে।
তোমায় দিতে পূজার থালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি।

পূষণ বলল, "ওই বাদী-বিবাদীর পর প্রথম লেখা এটাই। মাঝখানটা পুরো ফাঁকা।"

"ব্রাহ্মী মানে তো শাক, খেলে স্মৃতি বাড়ে। কিন্তু বাদী-বিবাদী?"

মিত্রা বলল, "এই কথাটা তো মামলা-মোকদ্দমায় ব্যবহার করা হয়। এক পক্ষ বাদী, অন্য পক্ষ বিবাদী। তার সঙ্গে ব্রাহ্মীর কী সম্পর্ক? আর ব্রাহ্মী বিমুখ মানেই বা কী?"

"ব্রাহ্মী মানে তো আমি জানি শাক। আর কিছু হয়?"

"ব্রাহ্মী লিপি হতে পারে। ইতিহাসে পড়োনি?"

"একটা জিনিস হতে পারে," মিত্রা বলল, "বাদী-বিবাদী দিয়ে উনি মামলার কথাই বলতে চেয়েছেন। হয়তো বলতে চেয়েছেন, রেগুলার কেস না পেলে অর্থাৎ আইনের চর্চা না থাকলে সবই ভুলে যেতে হবে।"

"কী ভুলে যেতে হবে?"

"আইনের বিভিন্ন রকমের ধারা! রেগুলার চর্চা না থাকলে সব তো আর মনে রাখা সম্ভব নয়।"

"তার মানে ব্রাহ্মী এখানে স্মৃতির সমার্থক?"

"ইয়েস, কারণ ব্রাহ্মী শাক খাওয়াই হয় স্মৃতি বাড়ানোর জন্য।"

"হবে হয়তো। কালিম্পং-এ পড়ে থাকলে আর বাদী-বিবাদী জুটবে কী করে? যাক গে, শুয়ে পড়ি," পূষণ উঠে দাঁড়াল।

মিত্রা খাতাটা দেখতে-দেখতে বলল, "তাতেই যা সম্পত্তি করে গিয়েছেন, জাস্ট ভাবা যায় না।"

পূষণ কিছু না বলে বাথরুমের দিকে গেল। মিত্রার একটু আগেও খুব টায়ার্ড লাগছিল। কিন্তু এখন এই ডায়েরি হাতে পেয়ে ক্লান্তিটা কেটে গিয়েছে। ও পাতাগুলো উলটে-উলটে দেখছিল।

পূষণ বাথরুম থেকে এসে বলল, "আলো নিবিয়ে দিই?"

মিত্রা বলল, "তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে?"

"না ঘুম পাচ্ছে না, রেচ্ছা পাচ্ছে।"

"সেটা আবার কী?"

"স্বেচ্ছা মানে কী?"

"স্ব ইচ্ছা।"

"গুড! তেমনই রেচ্ছা মানে 'র'-ইচ্ছা। বুঝলে?"

"না তো!"

"বোঝাচ্ছি," বলেই পূষণ মিত্রাকে জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমু খেল।

"কী হচ্ছে? প্লিজ়, আলোটা নিভিয়ে দাও!"

অনেকক্ষণ পর মিত্রা চোখ বুজে শুয়েছিল। সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারল পূষণ খাট থেকে নেমে, বারান্দার দিকের দরজা খুলে বাথরুমে গেল। ঘুমচোখে মিত্রার হঠাৎ খেয়াল হল, বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গিয়েছে পূষণ ঘরে ঢোকেনি।

মিত্রা উঠে দেখতে গেল আর তখনই ওর কানে কান্নার শব্দটা এল। বাগানের মধ্যে কে যেন করুণ স্বরে কাঁদছে। ওর চোখ পড়ল বাগানের দিকে। দেখল, বারান্দায় ছায়ার মতো কে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা চমকে উঠেছিল মিত্রা, তারপর দেখল পূষণ।

মিত্রা আস্তে-আস্তে পূষণের পাশে গিয়ে পিঠে হাত রাখতেই পূষণ মুখ ঘোরাল। মিত্রাকে দেখে বলল, "শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। কীসের আওয়াজ ওটা?"

"জানি না। ঝোপটা দেখেছ?"

অনি ইট ছোড়ার পর প্রাণীটা যে ঝোপের আড়ালে ঢুকে গিয়েছিল, সেখান থেকে একটা নীল আলো আসছে। হাওয়ায় ভাসছে কান্নার আওয়াজ। কারও যেন খুব কষ্ট হচ্ছে, সে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রেখে ওরা বুঝল, সারা বাগান জুড়ে কান্নার শব্দটা ভাসছে। যেন মাটির তলা থেকে উঠে আসছে শব্দটা।

মিত্রা ভয়ে পূষণকে জড়িয়ে ধরল। পূষণ বলল, "ঘরে চলো তো। টর্চটা এনে দেখা দরকার।"

"খবরদার না," মিত্রা পূষণকে টানতে-টানতে ঘরে নিয়ে এল, "সব সময় বাহাদুরি ভাল লাগে না।"

ওরা ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কান্নার শব্দটা ক্রমে বেড়েই চলল। তারপর মনে হল যেন, শব্দটা সারা বাগান জুড়ে চলেফিরে বেড়াচ্ছে। একবার বারান্দার নীচ থেকে আওয়াজটা আসছে, পরমুহূর্তে সেটা বাগানের অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে!

সঞ্জয়ের ঠিক করে দেওয়া গাড়ি নিয়ে ওরা আশেপাশে ঘুরতে বেরিয়েছিল। কাল রাত পর্যন্ত ঠিক ছিল যে, লাভা, লোলেগাঁও পর্যন্ত যাওয়া হবে। পরিকল্পনাটা পালটে গিয়েছে সকালবেলা। ভোর থেকে অনির ধুম জ্বর। প্রোগ্রামটা ক্যানসেল হওয়ার মুখে সঞ্জয় বললেন, "এরা বাড়িতে থেকে কী করবে? তার চেয়ে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসুক।"

অনিকে বাড়িতে রেখে কারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভ্র আর নীলিমাও জোর করে ওদের ঘুরতে পাঠালেন।

কালিম্পং শহরটার একদিকে ডেলো হিল্‌স এবং অন্যদিকে দুরপিনদারা। সে সমস্ত ছুঁয়ে আসার পর গাড়ি ওদের নিয়ে গেল নদীর ধারে।

পাহাড়ের গা বেয়ে নদীটা বয়ে চলেছে, পাড়ে ছড়ানো বালি। নদীর মধ্যে ছোট্ট-ছোট্ট পাথর আর একদম স্বচ্ছ জল। কোনো গভীরতা নেই। নীচের বড়-বড় গোল পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে। রিয়া ক্যামেরা বের করে নিচু হয়ে জলের মধ্যে মাছের ছবি তোলার চেষ্টা করছিল। নদীটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে একটু উঠলেই বড়-বড় পাথর আর জঙ্গল। ওরা পাহাড় বেয়ে উঠছিল। বেশ অনেকটা উঠে আসার পর একটা সরু রাস্তা পাহাড়টা ভেদ করে ভিতর দিকে ঢুকে গিয়েছে।

"আরে না! আমার পথে-পথে পাথর ছড়ানো," রিয়া গেয়ে উঠল। তারপরে গটগট করে ওই রাস্তাটায় ঢুকল। বাকিরাও ওর পিছন-পিছন চলল।

ওদের খেয়ালই ছিল না যে, কতটা চলে এসেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু উপরে গাছের আড়ালে একটা উঁচু চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

কাছে আসতেই বোঝা গেল, ওটা একটা মন্দির। সামনে একচিলতে ফাঁকা জায়গায় একটা খুব লম্বা খুঁটি পোঁতা। তার গায়ে একটা বড় গোল চাকতি লাগানো। ঠিক যেন একটা মাটির থালার মাঝখান দিয়ে গর্ত করে, খুঁটিটা দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুঁটির উপরে একটা ত্রিশূলের মতো কিছু।

দিয়া বলল, "এটা কীরকম মন্দির? বাইরে ত্রিশূল রয়েছে, কিন্তু মন্দির যেরকম দেখতে হয়, এটা সেরকম না।"

পূষণ খুঁটিটার সামনে দাঁড়াল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পিছিয়ে গিয়ে ক্যামেরা বের করল। মিত্রাকে বলল ওর সামনে দাঁড়াতে।

চাকতিটা নীল, ভিতরে একটা ফুল আঁকা রয়েছে। প্রচুর পাপড়ি ফুলটাতে। তার মধ্যে একটা ত্রিভুজের উপরে উলটোনো আর-একটা ত্রিভুজ। তাদের ভিতরে আবার খুব ছোট-ছোট করে কী একটা লেখা রয়েছে।

"পূষণদা, এখানেও স্টার অফ ডেভিড। খুব সাসপিশিয়াস ব্যাপার!" দিয়া বলল।

পূষণ বলল, "সে তো বটেই। তবে সাসপিশিয়াস ব্যাপারটা এখানে নয়, আমাদের বাড়িতে।"

কিঙ্কর হাসতে-হাসতে গলা নামিয়ে বলল, "পূষণদা, লামা-ই জামাই!" বলে রিয়ার দিকে ফিরে বলল, "রিয়াদি, তোর বর!"

"কোথায়?" মিত্রা ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল, লাল আলখাল্লা পরা কয়েকটা লোক ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে ট্রেনের সেই ছেলেটাও রয়েছে। যাওয়ার সময় বারবার রিয়াকে দেখছিল।

রিয়া ভাল করে ওড়নাটা জড়িয়ে নিয়ে কিঙ্করকে বলল, "সবসময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।"

তারপর মিত্রার দিকে সরে এসে বলল, "মিত্রাদি, এবার চল এখান থেকে।"

মিত্রা বলল, "এই লোকগুলোকে একদম পাত্তা দিস না। তা হলে পেয়ে বসবে। আমরা এতজন রয়েছি, ঘাবড়াস না।"

"সেজন্য নয়," রিয়া গলা নামিয়ে বলল, "আমার পেটব্যথা শুরু হয়েছে।"

মিত্রা একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল বোনের দিকে। রিয়াও তাকিয়ে রইল। তারপর দু'জনেই হেসে ফেলল। মিত্রা বলল, "খুব অসুবিধে হচ্ছে?"

"আস্তে! ওরা শুনতে পাবে। অসুবিধে অ্যাজ় সাচ হচ্ছে না, কিন্তু ভালও লাগছে না।"

কিঙ্কর সম্ভবত রিয়াকে রাগানোর জন্যই ওই ছেলেটাকে ডেকে বলল, "হাই, হাউ আর ইউ?"

ছেলেটা ভাবলেশহীন মুখে ওর দিকে তাকাল, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। বরং তাড়াতাড়ি পা ফেলে অন্য সঙ্গীদের কাছে এগিয়ে গেল।

পূষণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজার ঠিক মাথায় এরকম একটা চিহ্ন আঁকা রয়েছে।



ক্যামেরা বের করে ছবি তুলল । তারপর খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। ওকে দরজার সামনে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিত্রারা উঠে এল।

"কী দেখছ এটা?"

মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"এটা কীসের ছবি বলো তো? বজ্র!"

"বজ্র মানে? বাজ? বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা?" রিয়া বলল।

"না, এর মানে শূন্য। যা থেকে জগতের আবির্ভাব। এটা সেই বজ্রের প্রতীক।"

"সব ট্যান হয়ে গেল।" দিয়া বলল।

পূষণ বলল, "বজ্রযানের কথা শুনেছিস? বৌদ্ধধর্ম আর তন্ত্রের একটা মিক্সচার হল বজ্রযান। এই ছবিটা ওদের প্রতীক। এখানে ভাল করে আঁকেনি। বেসিক্যালি, বজ্রের দু'পাশে এগুলো পদ্মফুল, আটটা করে পাপড়ি রয়েছে।"

"এসব তো তোমার জানার কথা নয়," মিত্রা মুখে দুষ্টুমি মাখানো, "নিশ্চয়ই কল্লোলের ফান্ডা?"

পূষণ হেসে ঘাড় নাড়ল। দু'জনের কথা শুনতে-শুনতে রিয়ার বুকের মধ্যে আচমকা একটা চিনচিনে কষ্ট হল। এখানে বলা হল না। এ

যাত্রায় কি আর পূষণদাকে বলা হবে? বলতে না পারলে, সারাজীবন অন্য কোনও লোকের সঙ্গে ঘর করতে হবে। সেটা হলে ও জাস্ট মরে যাবে! কিন্তু বলতে পারলেই বা কী? সে কি সাড়া দেবে?

টি-ই-ই-ই-ই, একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দে ওরা চমকে উঠে পিছনে তাকাল। কিছুটা এগিয়ে রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। তার সামনে সেই লামা ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল ছেলেটা। তারপর রিয়ার দিকে তাকিয়ে, ডানহাতের অনামিকা তুলে একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল। তারপর আবার দাঁত বের করে হাসল। রিয়া মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ছেলেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের দেখল। তারপর আবার সেই ভঙ্গিটা করল।

পূষণ তেড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রিয়া থামিয়ে দিয়ে বলল, "ঝামেলা কোরো না। এখানে ওরা দলে ভারী। চলো, বেরিয়ে যাই।"

ছেলেটা হাসছিল। সেসময় নীচ থেকে কেউ কিছু বলতে ও চেঁচিয়ে সাড়া দিল তারপর ঢাল বেয়ে নেমে গেল।

"দিয়া কোথায়? কিঙ্কর?" মিত্রা এদিক-ওদিক তাকাল।

ঘরের ভিতর থেকে দিয়ার গলা ভেসে এল, "মিত্রাদি, দেখবি আয়! পূষণদা।"

মেঝের উপর একটা বিরাট বৃত্ত আঁকা। তার চারপাশে অসংখ্য অর্ধবৃত্ত। তার মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ক খ গ থেকে ট ঠ অবধি লেখা রয়েছে। মাঝখানের ছবিটা দেখিয়ে দিয়া বলল, "দ্যাখো!"

কিঙ্কর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "স্টার অফ ডেভিড! কিন্তু মাঝখানে ওটা কী লেখা?"

মিত্রা বলল, "দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। অং।"

রিয়া বলল, "আমার খুব মিস্টিরিয়াস লাগছে। আমাদের বাগানে স্টার অফ ডেভিড কে আঁকল?"

"সেটাই তো প্রশ্ন। কে আঁকল? কেন আঁকল?" পূষণ মিত্রার দিকে ফিরে বলল, "কাল তোমাকে সাতটা চক্রের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? মনে হচ্ছে, এটাও সেরকমই একটা কিছু। কিন্তু একটু ডিফারেন্ট!"

"চক্র মানে?" রিয়া জিজ্ঞেস করল।

পূষণ একবার কিঙ্কর আর দিয়াকে দেখে নিয়ে বলল, "পরে বলব। ছবিটা মনে রাখিস!"

রিয়া ক্যামেরা অন করল।

"ওই ঘরটায় কী আছে?" বলে মিত্রা পাশের ঘরে এগিয়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই "মাগো," বলে লাফ মেরে বেরিয়ে এল। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেজায় ভয় পেয়েছে মিত্রা।

"কী হয়েছে?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"কী ভয়ংকর দেখতে একটা কালীঠাকুর! চলো, এখানে আর থাকতে হবে না।" বলে ও ঘুরে গেল।

"কালীমূর্তি? চলো তো দেখি," বলে পূষণ ভিতরের ঘরটায় ঢুকল। বিগ্রহ দেখে ওরও বুক কেঁপে উঠল।

"কালী কোথায়? এটা তো একটা মেল ফিগার।" পূষণ বলল।

বিগ্রহের সমস্ত দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, মুখ রাগে গনগন করছে। মাথার চুল শিখার মতো পিছনে উড়ছে। টকটকে লাল দুটো চোখ, সারা গা নীল, চারটে হাত। এক হাতে ওই বজ্র রয়েছে, আর-এক হাতে একটা মড়ার খুলি। সেটা আবার অর্ধেক করে কেটে পাত্রের আকার দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় হাতে ডমরু। পায়ের নীচে একটা শবদেহ। তার উপরে বাঁ পা রেখে তার উপর ডান পা তোলা রয়েছে। বিগ্রহের কোলে এক নগ্ন নারী। এক পা মাটিতে রেখে, অন্য পা দিয়ে বিগ্রহের কোমর জড়িয়ে, দু'হাত দিয়ে ওই পুরুষকে জড়িয়ে রেখেছে। একটা স্তন পিষে রয়েছে, অন্যটার উপর ওই পুরুষের অবশিষ্ট হাত। দেবীর মুখেও রাগ।

আচমকা পূষণ দেখল ঘরে ও একলা। ভয়ের চোটে কেউই ঘরে ঢোকেনি। বাইরে থেকে মিত্রা চেঁচাচ্ছে, "কী করছ তুমি ওখানে? চলে এসো।"

পূষণ বলল, "এক মিনিট," ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে গিয়ে থমকে গেল ও। মূর্তিটা যেন নড়ল! এতক্ষণ সোজা তাকিয়ে ছিল, কিন্তু এখন মুখটা পাশে ঘুরে গিয়েছে। হঠাৎ করে ধুনোর গন্ধই বা কোথা থেকে আসছে? এই গন্ধ তো একটু আগেও ছিল না! হঠাৎই পূষণের চোখে পড়ল, যে মড়াটার উপর বিগ্রহ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মুখে একটা বিশ্রী পৈশাচিক হাসি।

ওর গা ছমছম করে উঠল। ছবি তোলা মুলতুবি রেখে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে এল পূষণ।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সন্ধে নেমে গেল। হালকা একটা আলো তখনও উঁকি মারছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পূষণ দাঁড়াল সেই ঝোপটার কাছে।

মাটিতে আধলা ইটটা পড়ে রয়েছে। পূষণ তুলে দেখল, তার একদিকে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। ভুরু কুঁচকে ভাবতে-ভাবতে ও ঝোপটার কাছে গিয়ে, পাতাগুলো সরাতেই তাকে দেখতে পেল। মাটিতে পড়ে রয়েছে! অনির ইটেই হয়তো বেশ খানিকটা থেঁতলে গিয়েছে! পূষণের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ধরে নিতে হয় একেই কাল অনি ঢিল ছুড়ে মেরেছিল। কী হচ্ছে এ সমস্ত!

পূষণের সাংবাদিক সত্তা বলল, "ভাল করে ইনভেস্টিগেট করো, এটা দারুণ একটা স্টোরি হতে পারে।"

কিন্তু ওর ভিতরে কে যেন বলল, "আর থেকো না! চলে যাও, চলে যাও!" প্রায় দৌড়ে সিঁড়ির কাছে এসে পূষণ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল।

ঘরে তখন জমিয়ে আড্ডা হচ্ছিল। সকলেই রয়েছেন, একজন অচেনা ভদ্রলোক বসে ছিলেন। পূষণ ঢুকতেই সঞ্জয়জেঠু ওই ভদ্রলোককে বললেন, "এই হল মৃগাঙ্কর জামাই।"

অভ্র পূষণের দিকে ফিরে বললেন, "ইনি রাজীববাবু।"

পূষণ প্রণাম করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার কথাই এতক্ষণ শুনছিলাম। তোমরা নাকি বাগানে অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছ?"

পূষণ হাসল।

"রাজীবদা," অভ্র বললেন, "আপনি বাকিটা শেষ করুন।"

"হ্যাঁ, এতক্ষণ যা বললাম সেটা হল নদীতীরে বসে জপ করার ফল," রাজীববাবু আগের কোনও আলোচনার খেই ধরে বলতে শুরু করলেন, "তেমনই কোনও নির্জন বাগানে বসে তিন রাত আটহাজারবার মন্ত্র জপ করতে পারলে, দূর থেকে নাকি নূপুরের শব্দ শোনা যায়। চতুর্থ দিনে তিনি সামনে এসে দাঁড়ান। পঞ্চমদিনেও তাই, তার সঙ্গে নূপুরের শব্দ বাড়তে থাকে। ষষ্ঠ

দিনে দেবী সাধককে পাঁচটা মোহর দান করেন। এতেই কিন্তু শেষ নয়।"

"তা হলে?" নীলিমার মুখে কৌতুকের হাসি।

"সপ্তমদিনে কোনও শিবলিঙ্গের কাছে বসে রাতে আটহাজারবার জপ করলে দেবী যুবতী রূপ ধরে সাধকের কাছে আসেন এবং সাধক তাঁকে যা হিসেবে পেতে চান, উনি সেই রূপেই ধরা দেন। সাধক চাইলে, স্ত্রী হিসেবে রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোরে চলে যাওয়ার সময় নিজের মুক্তাহার রেখে দিয়ে যান। সাধকের সম্পত্তির শেষ থাকে না। এমনকী সাধকের সমস্ত শত্রুও উনি নাশ করেন।"

রিয়া আর মিত্রা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। পূষণ বলল, "আচ্ছা ইনিই কি মধুসুন্দরী দেবী? তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পে যার কথা আছে?"

রাজীববাবু বললেন, "বলতে পারব না! তবে ভূতডামর তন্ত্র একে বলছে ভূতকাত্যায়নী দেবী। ভূতডামর এমন একজন দেবতা, যার নামে হিন্দুদের তন্ত্র আছে, আবার বৌদ্ধদেরও তন্ত্র আছে। বৌদ্ধদের ভূতডামরের গায়ের রং নীল, চারটে হাত। হাতে বজ্র থাকে, নানারকম মুদ্রা করা থাকে।"

"মুদ্রা মানে?" সুনন্দা জিজ্ঞেস করলেন।

"আঙুলের বিভিন্ন ভঙ্গি। সব ডেসক্রিপশন দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।" রাজীববাবু বললেন।

"ভূতডামরটা এগজ্যাক্টলি কে?" সুনীল জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই যে বললাম, বৌদ্ধদের দেবতা।"

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দেখে উনি বললেন, "বৌদ্ধ মানেই কিন্তু গৌতম বুদ্ধ নয়।"

পূষণ বলল, "জানি। প্রচুর দেবদেবী আছে।"

"রাইট। আচ্ছা, মহামায়া বলতে কী বোঝো?"

"দুর্গা।" সকলে সমস্বরে বলল।

"মাদার।" সঞ্জয় বললেন।

"বেশ," রাজীববাবু হাসলেন, "মহাযান মতে একজন দেবতা আছেন, হেরুক। তিনি অক্ষোভ্যকুলের দেবতা। মানে অক্ষোভ্য নামে

এক বুদ্ধ থেকে তাঁর সৃষ্টি। যদি তাঁর সঙ্গে বুদ্ধডাকিনী বলে এক দেবী থাকেন, তা হলে হেরুকের নাম হয় মহামায়া। বোঝা গেল?"

"হেরুক? অদ্ভুত তো নামটা!" মিত্রা বলল।

রাজীববাবু বললেন, "বৌদ্ধদের প্রচুর অদ্ভুত নামের দেবদেবী আছেন। 'হে' মানে শূন্যতা, 'রু' মানে বিচারবুদ্ধির লয় আর 'ক' মানে অজ্ঞেয়। এঁর উপাসনা করলে যেমন নির্বাণ লাভ করা যায়, তেমনই কাউকে বশীভূত করতে চাইলেও এঁর পুজো দরকার।"

"ক মানে কী বললেন?" রিয়া ভাল করে শুনতে পায়নি।

"ক মানে অজ্ঞেয়, ইনডিটারমিনেট। যে দেবতা শূন্যতার প্রতিমূর্তি, যিনি বিচারবুদ্ধির অতীত এবং যিনি অজ্ঞেয়, তিনিই হেরুক।"

"এসব মূর্তি কি সত্যিই-সত্যিই আছে?" সুনন্দা জিজ্ঞেস করলেন।

"নিশ্চয়ই। তবে খুব রেয়ার," রাজীববাবু বললেন।

"পূষণ কাল একখানা মূর্তি ট্রাঙ্ক থেকে খুঁজে বের করেছে," বলে সুধাংশু পূষণের দিকে তাকালেন, "কী যেন নামটা বলছিলে?"

"হরি-হরি-হরি বাহনোদ্ভব।" পূষণ বলল।

"তাই নাকি? দেখি একবার!" রাজীববাবু হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

মিত্রা উঠে গিয়ে মূর্তিটা নিয়ে এল। রাজীববাবু হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে তারিফ করলেন। "ভেরি গুড কালেকশন। ইউজুয়ালি এগুলো পাথরের বা মেটালের হয়। কিন্তু এটা হাড়ের। অনেক বেশি পাওয়ারফুল।"

"পাওয়ারফুল মানে?" সুনীল জিজ্ঞেস করলেন।

"পাওয়ারফুল মানে এই মূর্তির ভিতরে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এটা তো শো-পিস নয়, রীতিমতো ধুমধাম করে পুজো হয়। সব মূর্তিই কিন্তু এরকম পাওয়ারফুল হয় না। যেগুলো হাড়ের তৈরি, তাদেরই একমাত্র এরকম ক্ষমতা থাকে।"

"অলৌকিক ক্ষমতা মানে? কী হতে পারে?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"বলছি। আলোটা নেভাও।"

ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই মূর্তিটা থেকে একটা হালকা লালচে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই আলোটা দেখে অবাক।

“আলোটাই ইন্ডিকেট করে এর পাওয়ার। যত বেশি পাওয়ারফুল হবে, আলো তত বেশি জ্বলজ্বল করবে। এই মূর্তি নিয়ে সাধনা করলে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হতে পারে।”

অন্ধকারের মধ্যে রাজীববাবুর গলাটা গমগম করে উঠল। খানিকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না।

আলোটা জ্বালার পরে রাজীববাবু পূষণকে মূর্তিটা ফেরত দিয়ে বললেন, “খুব রেয়ার কালেকশন। কিউরিয়ো হিসেবেও ফরেনাররা পেলে লুফে নেবে।”

“হয়তো এটাই সেই কাপালিকের দেওয়া জিনিস!” সঞ্জয় বললেন।

“সেটা যদি হয়, তা হলে পূষণকে একটা প্রাইজ় দেওয়া দরকার।” সবিতা বললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে সুনীল ফুট কেটে বললেন, “আচ্ছা, এর জন্য নোবেল-টোবেল দেওয়া যায় না?”

কথা ঘোরাবার জন্যেই দিয়া বলল, “আজ আমরা একটা অদ্ভুত মূর্তি দেখেছি। মা কালীর মতো অনেকটা দেখতে, কিন্তু কালী নয়। মেল ফিগার।”

“কোথায় দেখলে?” রাজীব জিজ্ঞেস করলেন।

পূষণ সম্পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, “মূর্তিটা কার?”

রাজীববাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, “না দেখলে বলতে পারব না। তবে যেরকম বলছ, তাতে মনে হচ্ছে আইদার ভূতডামর অর বুদ্ধকপাল। বুদ্ধকপালও কিন্তু ওই হেরুকের আর-একটা ফর্ম।”

“রিয়াদি, তার মানে ট্রেনে তোর লামা জল নেওয়ার সময় লর্ড হেরুক বলেছিল, আমরা হেরো শুনেছিলাম।”

‘তোর’ আর ‘লামা’ শব্দ দু’টোর উপর জোর দিয়ে কিঙ্কর রিয়ার পিছনে লাগার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মিত্রা চোখের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিল।

“এখানে এমন দেবতার মন্দির আছে?” পূষণ জিজ্ঞেস করল।

“আছে মানে? ভেরি মাচ আছে,” রাজীববাবু বললেন, “পাহাড়ি অঞ্চলে তো এসব অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার নিয়ে ভাল মতোই চর্চা হয়। সাধারণত এরা গুপ্তভাবেই থাকে। তবে কিছু-কিছু সাইন আছে, যা দিয়ে ওদের লোকেট করা যায়।”

"যেমন?" সুনীল বললেন।

"সে নানারকমের সাইন আছে। এভাবে কি বলা যায়?" রাজীব একটু থেমে বললেন, "যেমন ধরুন, সাধনার এক-একটা স্তরের জন্য এক-একটা স্পেশ্যাল জায়গা আছে। এই অঞ্চলে দেখবেন প্রচুর মনাস্ট্রি। কোনও-কোনও মনাস্ট্রিতে নানারকমের সিম্বল লুকোনো থাকে, যেটা দেখে ওরা নিজেরাই বুঝতে পারে এটা কোন স্তরের সাধকদের জন্যে। আমরা বাইরে থেকে দেখে কিছুই বুঝতে পারব না।"

"যদি গুলিয়ে যায়?" দিয়া জিজ্ঞেস করল।

ওর কথা শুনে রাজীববাবু হেসে বললেন, "গুলিয়ে যাবে কেন? সিম্বল ব্যাপারটা তো বেসিক্যালি একটা ভাষা। জাস্ট কতগুলো ছবি বা চিহ্ন দিয়ে তুমি অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবে। যারা সেটা জানে তাদের গুলিয়ে যাবে না।"

এবার মৃগাঙ্কর দিকে ফিরে রাজীববাবু বললেন, "আপনাদের বাড়িতে যে গ্রুপটা ঢুকতে চাইছে বা লুকিয়ে ঢুকছে, তাতে আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। আমি অবশ্য শিয়োর নই, কিন্তু মনে হচ্ছে তান্ত্রিকদের কোনও গ্রুপ পিছনে লেগেছে। ওদের এক-একটা গোষ্ঠী এক-একটা তন্ত্র মেনে চলে।"

"তা ওরা হঠাৎ আমাদের নিয়ে পড়ল কেন?" মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

"কী করে বলব? হয়তো আপনাদের বাড়িটা পছন্দ হয়েছে। এত বড় বাগান, নিজেদের মতো চর্চা-টর্চা করতে পারবে হয়তো। এমনও হতে পারে, আপনাদের ফ্যামিলির ইতিহাস কোনওভাবে ওরা জেনেছে। অপঘাতে মৃত্যু ওদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওরা মনে করে, অপঘাতে মৃত্যুর জায়গায় প্রচণ্ড শক্তি থাকে।"

"হুঁঃ! হতভাগা!" সুধাংশু বললেন।

"একটু সাবধানে থাকবেন।" রাজীব বললেন, "ওরা কিন্তু বিভিন্ন অভিচার ক্রিয়া করতে পারে।"

"মানে বাণ মারবে?" ঊর্মিলা বলেন।

"শুধুই বাণ? অনেককিছুই করতে পারে।"

"যেমন?" কিঙ্কর জিজ্ঞেস করল।

রাজীববাবু হাসলেন," অনেকরকমের আছে। ধরো, নিশির ডাক। রাতে তুমি ঘুমোচ্ছ, এমন সময় তোমাকে বাইরে থেকে কেউ ডাকল। কে তুমি জানো না। কিন্তু ঘুমের ঘোরে সাড়া দিয়ে বসলে। ব্যস, আর তোমাকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না! তুমি ঘুমের মধ্যেই উঠে বেরিয়ে যাবে।"

"সমন্যামবুলিজ়ম? মানে স্লিপ-ওয়াকিং?" পূষণ বলল।

সুনীল একবার আড়চোখে পূষণকে দেখে সবিতার দিকে তাকালেন। সবিতা সেটা খেয়াল না করেই বললেন, "আমাদের রিয়া যেমন! ছোটবেলায় ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে উঠে ঘুরে বেড়াত!" তারপরে সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকালেন।

সুনীল খুবই বিরক্ত হলেন। এসব কথা কি না তুললেই চলছিল না? এসব কথা যত কম লোকে জানে, ততই মঙ্গল। আফটার অল মেয়েটার তো বিয়ে দিতে হবে।

সবিতা এসবের কিছুই বুঝলেন না, মেয়ের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, "একবার তো ঘুমের মধ্যে উঠে সদর দরজার তালা খুলেছে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেট খুলেছে। নেহাত বাইরের গেটের চাবিটা খুঁজে পায়নি।"

"তুমি চুপ করবে," রিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ছোটবেলায় অনেকেই অনেক কিছু করে। সেসব নিয়ে এত বকবক করার কী আছে?"

সুনীল মনে-মনে খুশিই হলেন। মেয়ে ঠিকই করেছে! লোকের সামনে কাছা খুলে বকবক করার ফল বোঝো এবার! সকলে একটু থতমত খেয়ে গেল।

সঞ্জয় হাত তুলে বললেন, "ইট্‌স ওকে। ওর পার্সোনাল ঘটনাকে এভাবে ডিসকাস করা ঠিক নয়।"

রাজীববাবু স্মিত হেসে পূষণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি কিন্তু স্লিপ ওয়াকিং-এর কথা বলছিই না। এটা একদম আলাদা। এখানে কী হয়, কেউ তোমার নাম ধরে বারবার ডাকে। তুমি সাড়া দিলেই তার খপ্পরে পড়ে যাবে এবং তার কাছে চলে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না!"

"এরকম হতে পারে? আপনি দেখেছেন?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

রাজীববাবু হাসলেন। তারপর বললেন, "বাদ দাও! এরকম অনেক কিছুই শুনতে পাবে। ধরো, শকুনের পা। কী যে মারাত্মক জিনিস

ভাবতে পারবে না! ওতে কুর্চিফুলের রস মাখিয়ে এক অমাবস্যায় শ্মশানে পুঁতে রেখে, পরের অমাবস্যায় তুলে আনলে নাকি প্রাণসঞ্চার করা যায়। এবার ওই পা-টাকে যার উদ্দেশে ছাড়া হয়, তার ভিটেমাটি উচ্ছেদ হয়ে যায়। শুনেছি, সে জাস্ট আঙুলের উপর ভর করে ঘুরে বেড়াতে পারে। এই ঘটনাটা ঘটতে আমি দেখিনি। তবে শুনেছি, এই চত্বরে নাকি এমন লোক আছে, যারা এটা করতে পারে।"

রাজীববাবুর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে, ঘরের মধ্যে বসেও পূষণের গা ছমছম করে উঠল। একটা জিনিস ও দেখেছে, কিন্তু এখন কাউকে সেটা বলা যাবে না। ও ঠিক করল, সুযোগ করে রাজীববাবুকে ঘটনাটা বলবে।

সুনীলবাবু বললেন, "রাজীবদা, আপনি বিশ্বাস করেন এসব?"

"ইয়েস," রাজীববাবু ঘাড় নাড়লেন, "আমি নিজে অনেককিছু দেখেছি।"

"আপনি ওই নিশির ডাক ব্যাপারটা দেখেছেন?" একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরির গন্ধে পূষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

"ছাড়ো না!" রাজীববাবু এড়িয়ে গেলেন।

"কিন্তু এটা কি সম্ভব? এটা কখনও হতে পারে?"

রাজীববাবু খুব দৃঢ় গলায় বললেন, "তোমাদের গাঁজাখুরি মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে কি কিছু আসে যায়?" সকলে সম্মোহিতের মতো রাজীববাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। উনি আবার বললেন, "আমি অনেকদিন ধরে ওদের নিয়ে কাজ করেছি। আমি জানি কোনটা হতে পারে, কোনটা পারে না। তোমরা বিশ্বাস করো না, ফাইন! কিন্তু তাতে তো আর জিনিসটা নালিফায়েড হবে না। ঠিকঠাক জিনিসপত্র পেলে আর যোগ্য লোকের হাতে পড়লে, এই ক্রিয়াকর্ম যে কী মারাত্মক হতে পারে, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

পূষণের চোখের সামনে বিকেলে ঝোপের ভিতরের দৃশ্যটা ভেসে উঠল। ও রাজীববাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সিম্বলজির ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।"

রাজীববাবু একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপরে বললেন, "বলো,"

সেই দেখে মৃগাঙ্ক বললেন, "পূষণ রাত হচ্ছে, আজ ওঁকে ছেড়ে দাও। আমরা তো আরও ক'দিন আছি, কথা বলে নিয়ো।"

পূষণ অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। সেই দেখে রাজীববাবু বললেন, "ওর খিদে এখনও মেটেনি। কিন্তু আমাকে যে এবার উঠতে হবে! তুমি এক কাজ করো,"

পূষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রাজীববাবুর দিকে।

"কাল সকালের দিকে চলে এসো আমার বাড়িতে। অবশ্যই যদি তোমার অন্য কোনও কাজ না থাকে!"

"না না, আমার আবার কাজ কী? আমি যাব।" পূষণ বলল।

রাজীববাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এরা সকলেই আমার বাড়ি চেনে। ঋষি বঙ্কিম পার্কের উলটোদিকে। উপরে উঠতে হবে। সঞ্জয়দা, আপনি ওকে ডিরেকশন দিয়ে দেবেন।"

"আপনার অসুবিধে হবে না তো?"

রাজীববাবু হাসলেন, "আমি রিটায়ার্ড লোক। কোনও কাজ নেই, আড্ডা মারা ছাড়া। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। বাই, গুড নাইট।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পূষণ দেখল, দীর্ঘ শরীরটা অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে। ঋষি বঙ্কিম পার্কটা এখান থেকে অনেকটাই উপরে। যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস না করলেও ওই অভিচার ক্রিয়া ব্যাপারটাকে পূষণ উড়িয়ে দিতে পারছে না। ও বুঝতে পারছে, ওর নিজের ভিতরেও একটা ভয় তৈরি হয়েছে। অনির ঢিলে কে আহত হয়েছে দেখতে গিয়ে ও ঝোপের ভিতরে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পেয়েছে। কালো, রোমশ। ঝোপের মধ্যে নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে ছিল। ইট লেগে অনেকটাই থেঁতলে গিয়েছে, রক্ত শুকিয়ে রয়েছে, একটা শকুনের পা!

॥ ৯ ॥

"ঠগ হলে ঠগ হবে।"

"কী?"

"বলছি যে, তুমি যদি ঠগ হও, তা হলে তুমি ঠগ হবে। ঠগ হলে ঠগ হবে।"

"সে আবার কী?"

"জানি না। আস্ক গৌরীকান্ত রায়। প্রথম ঠগের নীচে আবার হলুদ কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা।"

রাতে শুয়ে-শুয়ে পূষণ সেই ডায়েরি খুলে দেখছিল। মিত্রা আয়নার সামনে। ওকে দেখতে-দেখতে পূষণ জিজ্ঞেস করল, "তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?"

"ডিপেন্ড করে। যেমন, এখন আমার উদ্দেশ্য এই ডায়েরিটা পড়া। এখানে আসার আগের দিন অবধি উদ্দেশ্য ছিল, পেপারটা ভাল করে দাঁড় করানো। যাতে মাদ্রাজ স্কুল অফ ইকনমিক্স ওটা সিলেক্ট করে।"

"ভেরি গুড। গৌরীকান্ত রায়ের জীবনের উদ্দেশ্য জানো? শোনো," বলে পূষণ পড়তে শুরু করল, " উনি লিখছেন, 'আমার জীবনের উদ্দেশ্য, হত্যা করা, মিথ্যে বলা, যা আমার নয়, তা গ্রহণ করা, পরদার গমন করা'।"

"যাহ্! কী উলটোপালটা বকছ বলো তো তখন থেকে?" মিত্রা বিছানায় উঠতে-উঠতে বলল।

"উলটোপালটা নয় বস! গৌরীকান্ত রায় কী দু'নম্বরি পাবলিক ছিল মাইরি! বলছে, নারীসঙ্গ থেকে যে সুখ পাওয়া যায়, সে-ই মহাসুখ।"

মিত্রা খাটে উঠেই ডায়েরিটা টেনে নিল। যে পাতাটা খোলা ছিল, তাতে একটা আয়তকার ক্ষেত্র, তার ভিতরে একটা বৃত্তের ছবি। তার ভিতরে আবার নানারকম জ্যামিতিক নকশা আঁকা। মাঝখানে কিছু আঁকিবুকি করা আর নীচের দিকে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, ঠগ হলে, ঠগ হবে।

"এই ছবিগুলো কীসের, মর্মোদ্ধার হয়েছে?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"খুব একটা না। অল্পসল্প বুঝেছি।"

"যেমন?"

"যে চক্রের কথা তোমাকে বলেছিলাম, মনে হচ্ছে তারই রকমফের।"

মিত্রা বলল, "আচ্ছা রাজীবজেঠু ওই মূর্তিটার একটা নাম বললেন না? আমরা যেটাকে মা কালী ভেবেছিলাম।"

"বুদ্ধকপাল?"

"না, আর-একটা কী?"

"ভূতডামর?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূতডামর। আচ্ছা, তার মানে গৌরীকান্ত কি ভূতডামরের ভক্ত ছিলেন? কারণ ওই মন্দিরে যে সিম্বল রয়েছে, ওঁর খাতাতেও সেই একই সিম্বল রয়েছে!"

"কী করে বলব, কার ভক্ত ছিলেন! খুব পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। তবে একটা জিনিস ক্লিয়ার, তোমাদের ফ্যামিলিতে একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে। উনি মাঝেমধ্যে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলছেন। এই যে দ্যাখো," পূষণ পাতা উলটে সামনের দিকে চলে গেল।

লেখা রয়েছে, *বজ্রপদ্ম-বৈরোচন। জল আসলে স্থির। কোনও ক্ষোভ নেই, অক্ষোভ্য।*

একটা অদ্ভুত ছবি আঁকা, মুখোমুখি দুটো সাদা ড্রাগন। দুটো ড্রাগনেরই মাথার উপর একটা করে চাকা। চাকার উপর একটা করে নীল রঙের হাতির মাথা। তাদের উপরে দুটো লাল ময়ূর পেখম তুলে রয়েছে। ময়ূর দুটোর মাথায় ঝুঁটির উপরে আবার দুটো ছোট সবুজ বুদ্ধমূর্তি।

খানিকটা গ্যাপ। তারপর লেখা, *বাঁশের জঙ্গল ছাড়ালে ত্রিকেশীর স্থির জল।*

আবার কিছুটা ফাঁকা। তারপর লেখা, *পুণ্য হল দহনদানে, এ জীবন।*

মিত্রা সব দেখেশুনে বলল, "আমি এক বর্ণ বুঝলাম না। তুমি বুঝেছ?"

পূষণ বলল, "একটা জিনিস খুব পরিষ্কার করেই বুঝেছি। অন্যটা আন্দাজ করতে পারছি।"

"কী বুঝেছ?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"ভদ্রলোক ছবিটা ভালই আঁকতেন!"

"উফ, জ্বালিয়ো না তো," মিত্রা হেসে ফেলেছে, "কী আন্দাজ করতে পারছ বলবে?"

"বোধহয় পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের কথা বলছে। তার মধ্যে বৈরোচন আর অক্ষোভ্যর নাম তো বলেই দিচ্ছেন। বাকি তিনটের নাম যদিও বলেননি। আর আমিও কিছু বুঝিনি।"

"এই ময়ূর, হাতি আর ড্রাগনের মানে কী?"

"জানি না। মে বি ওদের প্রতীক। আই অ্যাম নট শিয়োর। কিন্তু ঠগ হলে ঠগ হবে মানে কী?"

"বুঝতে পারছি না," মিত্রা বলল, "ঠগ শব্দটা তো খারাপ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। হঠাৎ এর মধ্যে তিনি ঠগের কথা টেনেছেন কেন? আচ্ছা, ঠগ বলতে, ঠগি মিন করছেন না তো? ওরাও তো একটা পার্টিকুলার সম্প্রদায় ছিল।"

"যাদের কর্নেল স্লিম্যান নিকেশ করেছে?" পূষণ বলল, "মনে হয় না! গৌরীকান্তের অনেক আগেই ঠগিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে কী হতে পারে?"

"কে জানে। কাল সকালে এই খাতাটা রাজীবজেঠুর বাড়িতে নিয়ে যাব ভাবছি। উনি যদি কিছু বলতে পারেন।"

মিত্রা বলল, "সকালে আমরা যখন বেরিয়েছিলাম, ওই লোকগুলো এসেছিল।"

"কারা?"

"ওই যে রিলিজিয়াস গ্রুপ। বাবাকে সোজাসুজি বলেছে যে, বাড়িটা ওরা চায়।"

"তারপর?"

"ন্যাচারেলি বাবা রাজি হয়নি। ওরা বলে গিয়েছে, বাড়িটা দিয়ে দিলেই ভাল। এ বাড়ি আমরা রাখতে পারব না। শেষ অবধি ওদের কাছেই আসতে হবে।"

"ওরা এগজ্যাক্টলি কারা? নিজেদের পরিচয় দিয়েছে?"

"দিয়েছিল! কী একটা আনকমন নাম, বাবার মনে নেই।"

"মুশকিল," পূষণ চিন্তিত মুখে বলল।

"বাবা খুব রেগে গিয়েছে। বলেছে, যা পারে ওরা করুক, যত কম দামই পাওয়া যাক, পার্টিকেই বিক্রি করা হবে। মা-কাকিমারা ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

"ভয় পাওয়ার কী আছে?" পূষণ বলল "বোঝাই যাচ্ছে, ওরা আমাদের ভয় দেখিয়ে বাড়িটাকে বাগানোর চেষ্টা করছে।"

"পিসিও এই কথাটাই বলছিল, আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি," বলে ঘর অন্ধকার করে মিত্রা শুয়ে পড়তেই পূষণ ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর

শরীরে হাত রাখল। সামনের টেবিলের উপরে হরি-বাহনোদ্ভব লালচে আভা ছড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

সেদিকে তাকিয়ে মিত্রা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। পূষণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আর-একটু নিবিড় হতে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই কোথাও খুব জোরে কাঁসর বেজে উঠল। আচমকা শব্দটা হতে দু'জনেই চমকে সরে গেল।

মিত্রা নাইটির বোতাম ঠিক করতে-করতে বলল, "কোথা থেকে আওয়াজটা এল, বলো তো?"

"জানি না, বোধহয় নীচের বস্তিতে কিছু পুজো-টুজো হচ্ছে। এদিকে এসো!"

কাঁসরটা একবার বেজেই থেমে গিয়েছে। মিত্রা পাশ ফিরে বলল, "একটা নূপুরের শব্দ পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।"

"ওই আলোটা কীরকম অদ্ভুত না? একটা হাড়ের মূর্তি থেকে আলো বেরোতে পারে?"

"না, পারে না। মূর্তিটা হাড়ের না অন্য কিছুর সেটা আগে দ্যাখো। ওসব গল্প নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, এসো।"

পূষণের হাত আবার উঠে এল মিত্রার পোশাকে আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের জানলা দিয়ে উগ্র ধূপের গন্ধ ভেসে এল।

"এ আবার কী রে?" মিত্রা বলে উঠল, "কে জ্বালিয়েছে ধূপটা? গন্ধটা আমার একটুও ভাল লাগে না। যে-কোনও ডেডবডির পাশে এই ধূপটা জ্বলে।"

"ধূপের নিকুচি করেছে," বলে পূষণ আবার মিত্রার শরীরে হাত রাখল। ওর ব্যস্ত হাত সরাতে-সরাতে মিত্রা বলল, "বাগান থেকে আসছে মনে হচ্ছে! নূপুরের আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ! কী করছ? উফ, ছাড়ো না!"

"নারীসঙ্গ থেকে যে সুখ পাওয়া যায়, সে-ই মহাসুখ। গুরুজনের আদেশ পালন করছি।" বলে খুকখুক করে হেসে পূষণ মিত্রাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরল।

মিত্রা বলল, "আজ ভাল লাগছে না, প্লিজ়।"

"কেন লাগছে না? একটু আগেও তো লাগছিল।"

"না।"

"কেন?"

"বাড়িতে যা হচ্ছে, কিছুই ভাল লাগছে না।"

"এত টেনশন কোরো না তো! ওরা আমাদের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইছে। কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে গেলেই দেখবে সব বন্ধ হয়ে যাবে।"

মিত্রা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পূষণ ওর ঠোঁট বন্ধ করে দিল। আবার ভীষণ জোরে কাঁসর বেজে উঠল।

মিত্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "বলছি ভাল লাগছে না, কেন জোর করছ?"

পূষণ আর কোনও কথা না বলে চুপ করে গেল। সারা শরীরে অতৃপ্তি। মিত্রা ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। পূষণের ঘুম আসছে না। বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে ও উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে। মিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরময় লালচে আভা। মূর্তিটা ব্যাগে না ঢোকালে সারারাত জ্বালাবে।

কোথাও একটা নিয়মিত ছন্দে কিছু বাজছিল, না বারান্দায় কেউ হাঁটছিল? মোটমাট একটা অদ্ভুত শব্দে রিয়ার ঘুমটা ভেঙে গেল। হঠাৎ জেগে উঠে ওর মনে হল, কেউ ওকে ডাকছে। কে?

রিয়া কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইল। আবার সেই ডাক। এবার আর সন্দেহ নেই, সে ডাকছে। হাউ ইজ় ইট পসিবল? ও কি রিয়ার মনের কথাটা বুঝে ফেলেই এই রাতে চলে এসেছে ওর দরজার কাছে? একটা অদ্ভুত ভাললাগা নিয়ে রিয়া উঠে বসল। পাশের খাটে দিয়া অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সাবধানে খাট থেকে নেমে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রিয়া। চাপা গলায় ডাক ভেসে এল, "রিয়া।"

রিয়া সেরকম চাপা গলায় বলল, "আসছি।"

সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রিয়া। বারান্দায় কেউ নেই। গেল কোথায়? আশ্চর্য তো! পাশেই মিত্রাদিদের ঘর বন্ধ। সে কোথায়?

তারপরই রিয়ার চোখ পড়ল বাগানে আর বুকের মধ্যে একটা মাদল বেজে উঠল। এতটাই যে গোলাপি নাইটি পরা অবস্থাতেই রিয়া বাগানে নেমে গেল। সারা বাগান জুড়ে একটা নূপুর বাজছে।

বাগানে নামতেই সে এসে রিয়ার হাত ধরল। পিঠে হাত রেখে কাছে টেনে নিল। রিয়ারও সারা শরীরে নূপুর বেজে উঠল। উত্তেজনার আবেশে ওর চোখ বুজে এল। প্রতিটি কোষ এখন ঝিমঝিম করছে। শরীরের সব ভর ছেড়ে দিয়ে, ও ভেসে যেতে থাকল। সারা শরীর জুড়ে একটা ঝরনা জেগে উঠেছে। ঝরনাটা ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে কোথাও। বাগানের শেষ মাথায় যে ফাঁকা ঘরটা আছে, সেদিকে ভেসে চলল দু'জনে।

কঠিন আলিঙ্গনের মধ্যে রিয়া তলিয়ে রয়েছে। সারা বাগান জুড়ে শুধু নূপুর আর নূপুর!

॥ ১০ ॥

পূষণের দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে, নিজের কাপে আরাম করে চুমুক দিয়ে রাজীববাবু বললেন, "ফেলে রেখো না কিন্তু, এখনই ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

পাশের প্লেট থেকে একটা কুকি তুলে নিয়ে পূষণ বলল, "ফার্স্টক্লাস চা। এই কুকিজ়ও কি এখানকার?"

"না না, ওটা গ্লেনারিজ়-এর। এখানকার ওসি আমার প্রাক্তন ছাত্র। এখনও যোগাযোগটা রেখেছে। ও দার্জিলিঙে গেলেই আমার জন্য নিয়ে আসে।"

পূষণ আর-একটা কুকি তুলতে-তুলতেই রাজীববাবু বললেন, "কাল সিম্বলজি নিয়ে কী জানতে চাইছিলে?"

"মিত্রার প্রপিতামহ গৌরীকান্ত রায়ের খাতার মধ্যে বেশ কিছু সিম্বল আছে, যেটা ধরতে পারছি না," খাতাটা খুলে রাজীববাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল পূষণ।

পূষণের হাত থেকে খাতাটা নিতে-নিতে রাজীববাবু বললেন, "কাল তোমার শ্বশুরমশাই বলছিলেন, তুমি নাকি পুরনো ট্রাঙ্ক ঘেঁটে কীসব বের করেছ! ভেরি গুড!"

রাজীববাবু আপনমনে পাতা উলটোতে-উলটোতে বিড়বিড় করলেন, "আমার *মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে/ তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে?* পাশে ছবি এঁকে চমৎকার ইউজ় করেছেন ভদ্রলোক। যে বোঝার শুধু সেই বুঝবে। বাহ্।"

রাজীববাবুর মুখটা উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে, "তোমার শ্বশুরমশাই তাঁর দাদুর ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু তুমি তো অনেক বেশি জিনিস বের করে ফেলেছ হে! শাবাশ," পাতা উলটোতে-উলটোতেই বললেন, "তুমি পড়েছ এটা?"

"একটু-আধটু দেখেছি। কিন্তু মানে বুঝতে পারিনি। যেমন এক জায়গায় উনি বলেছেন, ঠগ হলে ঠগ হবে। তার মানে কী?"

"কাল শুনেছিলাম উনি নাকি তন্ত্রের চর্চা করতেন। কিন্তু যা দেখছি মনে হচ্ছে, উনি বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন। বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া আছে?" রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"খুব সামান্য। যেমন, হীনযান-মহাযান ছাড়াও আরো নানারকম মত ছিল। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ় বজ্রযান। তার থেকেই বৌদ্ধতন্ত্র।" পূষণ বলল।

"রাইট। ভারতবর্ষে না থাকলেও নেপাল-তিব্বত, এসব জায়গায় এখনও বৌদ্ধতন্ত্র ভাল মতোই আছে," রাজীববাবু বললেন, "এই ছবিটা দ্যাখো। জানো তো কী?"

পূষণ ঘাড় তুলে দেখল আধখানা চাঁদ আর তার মাঝখানে একটা সূর্য। ও মাথা নাড়ল।

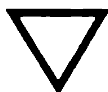
"ওঁ মণি পদ্মে হুং কথাটা শুনেছ নিশ্চয়ই?" রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," পূষণ ঘাড় নাড়ল।

"মানে জানো?"

"একটা মন্ত্র, তাই না?"

"মন্ত্র তো বটেই, একমনে একলক্ষবার এটা জপ করতে পারলে নাকি অবলোকিতেশ্বর দেখা দেন," বলতে-বলতে রাজীববাবু কাগজে একটা ত্রিভুজ আঁকলেন।



তারপর বললেন,“এটা কী জানো?”

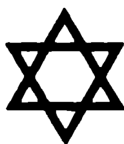
“ফিমেল অরগ্যান।” পূষণ বলল।

“এটা হল পদ্ম,” বলতে-বলতে রাজীববাবু পরের ত্রিভুজটা আঁকলেন।



“এই হল মণি, পদ্মের মেল কাউন্টারপার্ট।” বলে রাজীববাবু পূষণের দিকে তাকালেন। পূষণ মন দিয়ে লক্ষ করছিল।

“এবার যদি এই মণি এবং পদ্ম একে অপরের উপর চাপে, তা হলে কীরকম হবে, বলো তো?” বলতে বলতে তিনি পাশে একটা ষড়কোণ আঁকলেন।



“তোমাদের বাগানে এরকম তিনটে ছবিই তো ছিল?”

“হ্যাঁ, স্টার অফ ডেভিড।”

“এরা বলে ষড়কোণ। এই চিহ্নটা কী বলতে চাইছে, বুঝতে পেরেছ? এই হল হুং। হুং মানে মন্থন। ফিজ়িক্যালি যখন হুং-এর কাজ হচ্ছে, তখন একটা অসামান্য আনন্দের সৃষ্টি হচ্ছে। এই আনন্দ কিন্তু যৌন আনন্দ নয়।” রাজীববাবু থামলেন।

পূষণ কোনও কথা না বলে তাকিয়ে ছিল রাজীববাবুর দিকে।

উনি বলতে থাকলেন, “এই সিম্বলটাকে তিব্বতিতে বলে যব-যুম।

যব-যুম পোজ়িশনে দু'জন মানুষ এক হয়ে যায় আর চরম আনন্দ লাভ করে। যদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক হয়ে যায়, তা হলে সেই আনন্দ কী তীব্র হবে, চিন্তা করো তো। তোমাদের বাগানে এর উপর সাদা আর লাল রং দিয়ে পান আঁকা ছিল না?"

"হ্যাঁ!"

"সাদা রংটা রিপ্রেজ়েন্ট করছে মেল সিড। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভাষায় কর্পূর আর লালটা ফিমেল সিড মানে রক্ত। একইভাবে চাঁদ মানে ফিমেল অরগ্যান আর সূর্য মেল। চাঁদ আর সূর্যের এক হওয়া, বুঝতেই পারছ। তার সঙ্গে মিলিয়ে কবিতার লাইনটা পড়ো।"

পূষণ ডায়েরিটা দেখতে-দেখতেই ঘাড় নাড়ল।

রাজীববাবু আপনমনেই বললেন, "না হে, বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস খুঁজে বের করেছ। রবি ঠাকুরের তান্ত্রিক ইউজ় আমি আগে অন্তত দেখিনি।"

"আমাদের বাগানে এটা পড়ে ছিল," পূষণ পকেট থেকে তিরওয়ালা বাংলার চার সংখ্যার মতো জিনিসটা বের করে রাজীববাবুকে দিল।

জিনিসটা দেখে রাজীববাবু বললেন, "কাল তোমাদের যা বলছিলাম অভিচার ক্রিয়া সম্বন্ধে, এটা তার সঙ্গে রিলেটেড। তিব্বতিতে বলে মারপো-কুশে-শায়া। তার মানে লালপদ্ম। তিরগুলোর মুখ উপর দিকে বেঁকিয়ে দিলেই পদ্মের মতো একটা শেপ নেয়। জিনিসটা বশীকরণের কাজে লাগে, প্রোভাইডেড এতে ঠিকঠাক মন্ত্র দেওয়া আছে।"

"বশীকরণ মানে?"

"মানে, আমি যদি তোমাকে এটা দিই, তা হলে তুমি আমার কন্ট্রোলে চলে আসবে। আমি তোমাকে যা করতে বলব, তাই করবে।"

রাজীববাবু ওর হাত থেকে খাতাটা দেখতে-দেখতে বললেন, "উনি খুন হয়েছিলেন মন্দির থেকে বেরোনোর সময়?"

পূষণ ঘাড় নাড়ল।

"এই খাতাটা ভাল করে পড়লে হয়তো বোঝা যাবে, উনি কেন খুন হয়েছিলেন। এত বছর পর তুমি কি ওঁর মৃত্যুরহস্য উদ্ধার করতে চাইছ?"

"না-না," পূষণ উত্তর দিল, "ওঁর লেখা পড়ে একটু কৌতূহল জাগছিল, জাস্ট সেটুকুই। আর কিছু না।"

রাজীববাবু কোনও কথা না বলে মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখে পড়েছে, গৌরীকান্তের জীবনের উদ্দেশ্য কূর্ম অবতার হওয়া। জীবনের উদ্দেশ্য, হত্যা করা, মিথ্যে বলা, পরদারগমন করা ইত্যাদি।

রাজীববাবু বুঝতে পারলেন, এর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে রয়েছে। ওঁর খুনের কারণটাও হয়তো জানা যেতে পারে।

"খাতাটা এত তাড়াতাড়ি পড়া সম্ভব নয়। আমি একদিন রাখতে পারি?"

"হ্যাঁ," পূষণ ঘাড় নাড়ল, "আচ্ছা, উনি যে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোট করেছেন, তার কি অন্য কোনও ইন্টারপ্রিটেশন আছে?"

"মনে তো হচ্ছে। তবে খাতাটা ভাল করে না দেখলে বুঝতে পারব না। অনেকগুলো ইন্ডিকেশন দেখতে পাচ্ছি।"

"যেমন?" পূষণ জিজ্ঞাসা করল।

একটু চুপ করে থেকে রাজীববাবু বললেন, "অনেক কিছু বলতে হবে। তবে তার আগে আমি খাতাটা ভাল করে পড়তে চাই। প্লিজ়, ডোন্ট মাইন্ড।"

"না না, এতে মনে করার কী আছে! আচ্ছা, এটার মানে কী?" ড্রাগন, হাতি, ময়ূরের ছবিটা বের করে দ্যাখাল পূষণ।

রাজীববাবু অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, "এগজ্যাক্টলি কী বলতে চেয়েছিলেন, ভেবে বলতে হবে। তবে উপর-উপর দেখে মনে হচ্ছে, পাঁচটা ধ্যানী বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। বৈরোচন আর অক্ষোভ্য তো বলাই হয়েছে। লাল রং, পদ্ম আর ময়ূর হল অমিতাভর প্রতীক, আর সবুজ রং হল..." কথা শেষ হওয়ার আগেই পূষণের ফোন বেজে উঠল। মিত্রা ফোন করেছে।

"হ্যালো, তোমরা কোথায়?"

"রাজীবজেঠুর বাড়িতে।"

"রিয়া তোমার সঙ্গে?"

"না তো। কেন?"

"রিয়া তোমার সঙ্গে যায়নি?"

"না, আমি একাই এসেছি। কেন?"

পূষণকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে রাজীববাবু উৎকণ্ঠিতভাবে

জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? এনি প্রবলেম?"

পূষণ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

হতভম্ব হয়ে রাজীববাবু বললেন, "সে কী!"

"হ্যাঁ। মিত্রা বলল যে, রিয়া নাকি সকাল থেকে বাড়িতে নেই।"

"কোথায় আর যাবে? দ্যাখো, মর্নিংওয়াকে গিয়েছে হয়তো। এখনই ফিরে আসবে।"

"আমারও তাই মনে হয়। আশেপাশে কোথাও আছে। কিন্তু বাড়িতে বলে যায়নি বলে সকলে চিন্তা করছে। যাই হোক, আমি আসছি। সন্ধেবেলা আসছেন তো? দেখা হবে।"

ভোরবেলা দিয়া ঘুম থেকে উঠে দেখেছে, দিদি পাশে নেই। কখন বেরিয়ে গিয়েছে ও জানে না। বেলা হয়ে গিয়েছে, অথচ রিয়াকে দেখা যাচ্ছে না। তখন ওকে খোঁজা শুরু হয়। মোবাইলে ফোন করতে দেখা গেল, রিয়া সেল নিয়ে বেরোয়নি। পূষণকে ফোন করার পর সকলেই চিন্তায় পড়ে গেল। পূষণের সঙ্গে না গিয়ে থাকলে, একা-একা কোথায় গেল মেয়েটা! বেলা এগারোটা অবধি যখন রিয়া ফিরল না, তখন থানায় যেতে হল। যেহেতু সঞ্জয় ছিলেন, তাই থানায় খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবু জানালেন যে, ওই রিলিজিয়াস গ্রুপটাকে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু তাদের পরিচয় কেউ দিতে পারল না।

পূষণ বেরিয়ে যাওয়ার পর খাতাটা নিয়ে বসলেন রাজীববাবু। একটু আগেই তাঁর চোখে পড়েছে 'স্বয়ম্ভুকুসুম' শব্দটা। পূষণের সামনে শব্দটা ব্যাখ্যা করতে তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন, তাই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই সংস্কৃতে ছোট-ছোট শ্লোক লেখা আছে। উনি সেগুলো দেখছেন আর নিজের খাতায় কপি করছেন। আস্তে-আস্তে ধোঁয়াশা কাটছে। যেটুকু পেয়েছেন তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে মোটামুটি ছবিটা বুঝতে পারছেন।

আপাতদৃষ্টিতে এলোপাথাড়ি মনে হলেও, এটা আদৌ তা নয়। বরং যথেষ্ট সুসংবদ্ধভাবে কথাগুলো বলা হয়েছে। রাজীববাবু খাতাটা নিয়ে

গৌরীকান্ত রায়ের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে পড়লেন। গৌরীকান্তের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, হত্যা করা, মিথ্যে বলা, যা তাঁর নয় তা গ্রহণ করা, পরদার গমন করা। সুখভোগের মধ্যেই মহাসুখ। নারীসঙ্গ থেকে যে সুখ পাওয়া যায়, সেই মহাসুখ। কোনও নারীকেই ঘৃণা করতে বারণ করেছেন উনি। নারীই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই নারী। সেই পারে মহাসুখে নিয়ে যেতে। গৌরীকান্ত লিখেছেন, 'সব নারীই তোমার প্রজ্ঞা আর তোমার উপায় তুমি।'

যে কেউ বলবে, গৌরীকান্ত লম্পট ছিলেন। কিন্তু এর আসল মানে ক'জনই বা বুঝবে? রাজীব উঠে গিয়ে একটা বই বের করে পাতা উলটোতে থাকলেন। পাওয়া গিয়েছে! ঠিকই ধরেছিলেন তিনি। ইন্দ্রভূতি রাজার মেয়ে লক্ষ্মীঙ্করা বলেছিলেন কথাগুলো। সেই শ্লোক গৌরীকান্তের ডায়েরিতে। আর কারা-কারা জানে? হঠাৎ তাঁর মাথায় খেলে গেল, রিয়ার অন্তর্ধানের পিছনে এই কথাগুলো নেই তো?

॥ ১১ ॥

সঞ্জয়ের মোবাইলে ফোনটা এল বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। দুর্বোধ্য ভাষায় বলা কথাগুলোর এক বর্ণও বোধগম্য হল না। তারপর লাইন কেটে গেল। সঞ্জয় স্ক্রিনে নম্বরটা দেখে বললেন, "ল্যান্ডলাইনের নম্বর," তারপর দ্রুত ওসিকে সব জানিয়ে নম্বরটা দিয়ে দিলেন। পার্টির তিন-চারটে ছেলেকেও ফোনে ডেকে পাঠালেন উনি।

বসার ঘরে অভ্র আর মৃগাঙ্ক সুনীলের পাশে বসেছিলেন। উলটোদিকের সোফায় পূষণ। সঞ্জয় আলতো পায়ে উঠে সুনীলের সামনে দাঁড়ালেন। "এত ভেঙে পড়লে চলে? পুলিশ পুলিশের মতো চলুক। আমার পার্টির ছেলেরা পাহাড় তোলপাড় করে রিয়াকে নিয়ে আসবে। একটু ধৈর্য ধরো।"

কথাটা শুনে সুনীল পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন। মৃগাঙ্ক আর অভ্র সামলালেন তাঁকে। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুব সংকুচিতভাবে রাজীববাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

"বসুন রাজীবদা, শুনেছেন তো?" মৃগাঙ্ক ধরা গলায় জানতে চাইলেন।

রাজীববাবু কোনও উত্তর দিলেন না। মৃগাঙ্ক নিজের মনেই বললেন, "কেন যে আমি গোঁ ধরলাম! ওদের বাড়িটা দিয়ে দিলেই হত। ওরা শাসিয়েছিল। বলেছিল, বাড়িটা আমরা রাখতে পারব না। পাত্তা দিইনি, ওরা ঠিক শোধ নিল।"

রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কারা শাসিয়েছিল?"

"ওই রিলিজিয়াস গ্রুপটা। কাল সকালে এসে ওরা বাড়িটা চাইল। স্বাভাবিকভাবেই রাজি হইনি। একপ্রস্থ তর্কাতর্কি হয়। তারপর লোকগুলো শাসিয়ে চলে যায়!"

আবার সঞ্জয়ের ফোনটা বেজে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর সঞ্জয় মৃগাঙ্ককে বললেন, "আমার ছেলেরা কোনও একটা খবর পেয়েছে, আমি বেরোচ্ছি। দেখি কী হয়!"

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমিও যাব।"

"না," সঞ্জয় ঘাড় নাড়লেন, "তোমরা বাড়িতেই থাকবে। কোনও খবর পেলে আমরা বাড়িতে ফোন করে দেব। রাতবিরেতে পাহাড়ি টেরেন তোমরা ন্যাভিগেট করতে পারবে না," বলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ইশারায় পূষণকে ডাকলেন।

পূষণ এগিয়ে যেতেই সঞ্জয় বললেন, "কাউকে এখনই কিছু বলার দরকার নেই। খবরটা খারাপ। সেই জন্যই আমি কনফার্ম করতে যাচ্ছি। খেয়াল রেখো, কেউ যাতে এখনই কিছু বুঝতে না পারে।"

ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে, পূষণের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে গেল। সঞ্জয়ের পথ আটকে ও জিজ্ঞেস বলল, "শুধু এটুকু বলুন, রিয়া আছে না নেই?"

"জানি না। ওর কি মর্নিংওয়াকের শখ ছিল? এখানে এসে একা-একা ভোরবেলা বেরিয়েছে?"

"না তো।"

"স্ট্রেঞ্জ! তা হলে আজ সকালে বেরোলই বা কেন!" সঞ্জয় কী বলবেন, বুঝতে পারছেন না।

"কী হয়েছে? কোথায় গিয়েছিল রিয়া?" পূষণের গলায় উৎকণ্ঠা।

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"মানে?" পূষণ এখনও কিছু ধরতে পারছে না।

"আমিও জানি না। এখনই যে ফোনটা এল..." সঞ্জয়বাবু সামান্য চুপ করে থেকে আবার বললেন, "ওরা বলছে, একটু আগে নাকি একটা গাড়িতে চেপে চারটে আর্মড লোক একটা মেয়ের বডি..." সঞ্জয় আর বলতে পারলেন না।

"কোথায়?" পূষণ জানতে চাইল।

"নীচে, তিস্তার কাছে। স্থানীয় লোকজন ভয়ে কিছু বলেনি। যারা দেখেছে, তারা বলল, মেয়েটার গায়ে একটা গোলাপি নাইটি ছিল।"

পূষণের গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

সঞ্জয়বাবু ওর হাতটা চেপে ধরলেন, "লেট মি কনফার্ম ফার্স্ট। ভেঙে পড়লে অন্যদের সামলাতে পারবে না। যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। এবার সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। প্রে ফর দ্য বেস্ট।"

সঞ্জয় বেরিয়ে গেলেন। পূষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মিত্রাকে কী বলবে? বাইরে আলো জ্বলছে। সন্ধে নামছে আস্তে-আস্তে।

দু'দিন আগেই কালিম্পং বেকারিতে খেতে-খেতে রিয়া বলছিল যে, সকলে মিলে একদিন গোম্ফুজে খেতে যাওয়া হবে। কাল বলছিল, মোষের শিঙের ফুলদানি কিনবে।

"কী হয়েছে পূষণ? এনিথিং সিরিয়াস? সঞ্জয়দা কী বললেন?" রাজীবজেঠু ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ডোন্ট গেট আপসেট। উনি কি কোনও খারাপ খবর সন্দেহ করছেন?"

পূষণ আবার মাথা নাড়ল।

রাজীববাবু চুপ করে থেকে বললেন, "আমার অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে কোরো না, মূর্তিটা কোথায়? হরি-হরি-হরি বাহনোদ্ভব?"

"আমাদের ঘরে," পূষণ উত্তর দিল, "ব্যাগে ঢোকানো আছে।"

"ওটা সাবধানে রেখো। মনে হচ্ছে, ওটাই আসল টার্গেট।"

"সাবধানেই রাখা আছে," পূষণের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরের ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল। দৌড়ে গিয়ে পূষণই ফোনটা ধরল। ওপাশ থেকে কেউ ইংরেজিতে বলল, "সো হোয়াট ডিড ইউ ডিসাইড অ্যাবাউট ইয়োর প্রপার্টি?"

পূষণ জিজ্ঞেস করল, "মে আই নো হু ইজ় স্পিকিং?"

ওপাশ থেকে একটা হাসি ভেসে এল, "হেরুকপা। হোয়াট ইজ় ইয়োর ডিসিশন?"

মৃগাঙ্ক ইশারায় পূষণ হাত বাড়িয়ে স্পিকারটা অন করে দিল। মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়্যার ইজ় আওয়ার ডটার?"

"শি ইজ় ফাইন। ডোন্ট ওরি।" পাশ থেকে কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

সুনীলবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাজীববাবুর ইশারায় মৃগাঙ্ক তাঁকে বসিয়ে দিলেন।

অভ্র জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী চান?"

"ভেরি সিম্পল। আপনাদের বাড়ি। আপনারা এটা ফেলে রেখে নষ্ট করছেন। আমরা এটা কাজে লাগাব।"

মৃগাঙ্ক বললেন, "ইটস ওকে। আপনারা আসুন, মুখোমুখি আলোচনা করা যাবে।"

ওপাশ থেকে আবার হাসির আওয়াজ ভেসে এল, "ওকে! আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে মোমোর দোকানটা আছে, হি ইজ় আ রিয়েল এস্টেট ব্রোকার। আস্ক হিম টু ফাইন্ড আ পারচেজ়ার ফর ইয়োর প্রপার্টি।"

"প্লিজ়, ওকে ছেড়ে দিন," সুনীলবাবু করুণকণ্ঠে বললেন, "আপনারা আমাকে হোস্টেজ রাখুন। কিন্তু ওকে ছেড়ে দিন।"

"ওকে বাই। "

"জাস্ট আ মিনিট প্লিজ়," রাজীববাবু ফোনটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, "প্লিজ় টেল আস ওয়ান থিং।"

"ইয়েস," ফোনটা কাটতে গিয়েও কাটল না লোকটা।

"আপনারা কারা? আপনারা সামনে না এসে, মেয়েটাকে ধরে রেখেছেন কেন?" রাজীববাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"কিছু মানুষ এমন জিনিস ইনহেরিট করে, যার উপর তাদের কোনও অধিকারই নেই। উই ক্লেম ইট অ্যান্ড উই হ্যাভ গট আওয়ার উইজ়ডম।"

ফোনটা কেটে গেল। পরমুহূর্তে রাজীববাবু লাফ মেরে উঠে বললেন, "ইমিডিয়েটলি থানায় খবর দিয়ে বেরোতে হবে। কুইক-কুইক।"

তাঁর শশব্যস্ত ভাব দেখে মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবে?"

"প্লিজ়, সময় নষ্ট কোরো না। পরে সব বলছি।"

"এক মিনিট, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। জাস্ট জ্যাকেটটা পরে নিই," বলে পূষণ ভিতরে ঢুকে গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পর পূষণ ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এল।

"মূর্তিটা নেই!"

"হোয়াট?" রাজীববাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

"হরি বাহনোদ্ভবের মূর্তিটা নেই," পূষণ বলল, "কাল রাতে টেবলের উপর ছিল। সকালে মিত্রা ধরে নিয়েছিল যে, আমি ওটা আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছি। আর আমার ধারণা ছিল, ও ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছে। আসলে রিয়াকে নিয়ে..."

রাজীববাবু বললেন, "এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ওরা ফোনে শেষ কথাটা কী বলল শুনলে তো? কিছু মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে এমন কিছু জিনিস পায়, যার উপর তাদের কোনও অধিকারই নেই। এনিওয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়ে লাভ নেই। থানায় চলো।"

সাড়ে ছ'টা বাজে। কালিম্পং-এর রাস্তাঘাট একেবারে জমজমাট। যেতে-যেতেই রাজীববাবু বললেন, "কাল তোমরা যেখানে মন্দিরটা দেখেছিলে, সেই জায়গাটা চিনতে পারবে?"

"না, ড্রাইভার নিয়ে গিয়েছিল।" পূষণ উত্তর দিল।

"চিনতে পারবে না?" রাজীববাবু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"না।" পূষণ ঘাড় নাড়ল।

রাজীববাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "গাড়িটার নম্বর বলতে পারবে?"

"না," পূষণ উত্তর দিল, "সেসব মনে থাকে নাকি!"

রাজীববাবু ঠিক কী করতে চাইছেন, ওর কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। উনি কি ওই মন্দিরে যেতে চাইছেন? উনি কি ভাবছেন, ওখানেই রিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে!

"ড্রাইভারের নাম জানা আছে?" রাজীববাবু খুবই চিন্তিত লাগল।

"গগন," পূষণ উত্তর দিল, "গগন শেরপা। কিন্তু আমরা কী করব? আমরা কি ওই মন্দিরে আবার যাব?"

"ইয়েস," রাজীববাবু হাঁটার গতি বাড়িয়ে বললেন, "কুইক, ওসি বেরিয়ে গেলে মুশকিল হবে!"

প্রায় ছুটতে-ছুটতেই পূষণ বলল, "আপনার কি মনে হয়, রিয়াকে ওই মন্দিরে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে?"

রাজীববাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

দু'জনে যখন থানায় পৌঁছোল, তখন ওসি নেই। কোথায় গিয়েছেন, কেউ বলতে পারল না। কিন্তু বাকিরা রাজীববাবুকে খুব খাতির করে বসাল। ওরা জানে যে, ওদের ওসি ডঙ্গেল সাহেব ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন। ডঙ্গেল সাহেবের স্যার ছিলেন ইনি। সুতরাং কোনও অসুবিধে হল না। পরপর যা ফোন এসেছে, সেকেন্ড অফিসার নোট করলেন। ইতিমধ্যে যে নম্বর থেকে সঞ্জয়ের মোবাইলে ফোন এসেছিল, সেটা ট্রেস করে গিয়েছে। কালিম্পং বাজারের কাছে একটা পিসিও থেকে করা হয়েছিল। বুথটার মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেননি।

ওখানে বসেই রাজীববাবু ওসিকে মোবাইলে ফোন করে, ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন। ওসি সেকেন্ড অফিসারকে নির্দেশ দিয়ে জানালেন, উনি রাস্তায় আছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছোচ্ছেন।

ওসি ক্রিস্টোফার ডঙ্গেল এসে পৌঁছোনোর আগেই মোটরস্ট্যান্ডে খোঁজ নিয়ে গগন শেরপাকে গাড়ি সমেত ডেকে আনা হয়েছে। রাত তখন আটটা। সোয়া আটটা নাগাদ দুটো ভাড়া গাড়ি এবং একটা ভ্যানে মোট ছজন আর্মড পুলিশ, দু'জন মহিলা কনস্টেবল এবং একজন এএসআই নিয়ে বেরোনো হল।

গগনের গাড়িতে রাজীববাবু, পূষণ, মৃগাঙ্ক এবং একজন কনস্টেবল। অন্য গাড়িটায় তিনজন কনস্টেবল। বাকিরা পুলিশভ্যানে। শেষ মুহূর্তে রাজীববাবু পূষণকে বললেন, "মিত্রাকে আসতে বলো। রিয়াকে কী অবস্থায় পাওয়া যাবে ঠিক নেই। নিজেদের মধ্যে একজন মহিলা না থাকলে..."

মৃগাঙ্ক নেমে পিছনের গাড়িতে উঠলেন, মিত্রা বসল পূষণের পাশে।

রাজীববাবু গগনকে কিছু নির্দেশ দিতেই সে সোজা গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কিছুটা যাওয়ার পর রাজীববাবু মিত্রাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি, ডোন্ট মাইন্ড। রিয়ার কি এখন পিরিয়ডস চলছে? কিছু জানো?"

আচমকা কথাটা শুনে মিত্রা একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

"যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও। এখন লজ্জা পাওয়ার সময় নয়।"

"হ্যাঁ।"

"তুমি শিয়োর? ক'দিন হয়েছে?"

আড়চোখে সামনে দেখে নিয়ে মিত্রা বলল, "কাল থেকে শুরু হয়েছে।"

"তুমি শিয়োর তো?" রাজীববাবু এতটাই উৎকণ্ঠিত যেন, এটা জানলেই রিয়াকে খুঁজে বের করা যাবে!

"আমরা যখন ওই মন্দিরে ছিলাম, তখন শুরু হয়েছিল।"

"তার মানে আজ রাতে চিন্তার কোনও কারণ নেই।" রাজীববাবু আপনমনে বললেন। এতক্ষণে ওঁকে একটু আশ্বস্ত দেখাল। ভাল করে হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করলেন।

॥ ১২ ॥

জায়গাটায় ওরা যখন পৌঁছোল, তখন চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু নদীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

"এবার কোনদিকে?" রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"অন্ধকারে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।" পূষণের গলাটা বিব্রত শোনাল।

"ওকে নেভার মাইন্ড," রাজীববাবু বললেন, "টেনশন কোরো না। কাল এখানে এসে নামলে, তারপর কী করলে? কোনদিকে গেলে? মনে করার চেষ্টা করো।"

"আমরা পাহাড় বেয়ে উঠেছিলাম, বেশ অনেকটা।" মিত্রা বলল।

পুলিশের সঙ্গে টর্চ ছিল। সেগুলো জ্বেলে পাহাড়ের উপরে বেশ কিছুটা উঠে ওরা খেই হারিয়ে ফেলল।

"এদিক দিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু এরপর কোনদিক, সেটা বুঝতে পারছি না।" অসহায় গলায় জবাব দিল মিত্রা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেলেও কোনও চূড়া বা ত্রিশূল দেখতে পাওয়া গেল না।

একটা পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে জায়গাটার ডেসক্রিপশন আর-একবার দাও তো।"

"বেশ কিছুটা ওঠার পর একটা সমতল জায়গা পেয়েছিলাম। অনেকগুলো বড়-বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা ঢুকে গিয়েছিল ভিতর দিকে।"

"সামনে একটা সরু ঝরনা মতো ছিল," পূষণের কথা শেষ হতে না হতেই মিত্রা বলে উঠল, "তার উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। তারপর আবার কিছুটা উঠতে হয়েছিল।"

"গুড। কতটা উঠেছিলে, বলতে পারবে?" রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"বেশ খানিকটা। আসলে ওঠার সময় তো আমরা গল্প করতে-করতে উঠছিলাম, কাজেই কতটা উঠেছি খেয়াল করিনি। তবে ওখান থেকে আর নদীটা দেখা যাচ্ছিল না।" পূষণ বলল।

"তার মানে তোমরা পাহাড়ের ওই পাশটায় চলে গিয়েছিলে," রাজীববাবু টর্চ হাতে সামনে এগোলেন, পিছন-পিছন পূষণ আর মিত্রা। তার পিছনে নির্বিকার মুখে পুলিশের কনস্টেবলরা। সবচেয়ে পিছনে রইলেন মৃগাঙ্কবাবু। অভ্যেস নেই বলে এতটা উঠতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কিন্তু কিছু করার নেই। আফটার অল রিয়া তাঁর ভাগনি! তিনি আর কোন মুখে ক্লান্তির কথা বলেন!

আরও খানিকটা ওঠার পর মিত্রা বলল, "মনে হচ্ছে এই রাস্তাটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো সরু ঝরনাটা!"

রাজীববাবু পুলিশের এএসআইয়ের সঙ্গে নেপালি ভাষায় একটু আলোচনা করলেন। তিনি আবার তাঁর অধস্তন কর্মীদের কিছু আদেশ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তারা কোনও কথা না বলে ওই রাস্তা ধরে ভিতরে ঢুকে গেল। ওদের হাতের টর্চগুলো পাথরের উপর কিছুক্ষণ আলো ছড়াল। তারপর আবার সব অন্ধকার।

"রাজীবদা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।" মৃগাঙ্কর গলাটা খুবই

উদভ্রান্ত শোনাল। রাজীববাবু বললেন, “একটু ধৈর্য ধরো প্লিজ়। ওরা দেখতে গিয়েছে, সামনে কিছু আছে কি না। আগে নেমে আসুক। ভালয়-ভালয় সব মিটে গেলে, ফেরার পথে সব বলব। তবে আশা করি, কাল রাত পর্যন্ত রিয়ার কোনও ক্ষতি হবে না।”

“আপনি বলছেন?” মৃগাঙ্ক রাজীববাবুর হাত চেপে ধরলেন, ‘ওর কিছু হলে আমি কোন মুখে সবিতার সামনে দাঁড়াব? শুধু আমরা আসছি বলেই ওরা এসেছে...” ধরা গলায় বললেন মৃগাঙ্ক।

মিত্রা ওর বাবার হাতটা চেপে ধরল। রাজীববাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমরা সকলেই আসলে ভীষণ অসহায়।”

কিছুক্ষণ পর দু’জন নেমে এসে জানাল, উপরে একটা মঠের মতো দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ওখানে অলরেডি সার্চিং শুরু হয়ে গিয়েছে। ওরা এসেছে পূষণদের নিয়ে যেতে।

“এই রে,” বলেই রাজীববাবু তাড়াতাড়ি এগোতে শুরু করলেন। কিন্তু কী-ই বা করবেন! একে বয়স হয়েছে, তার উপর জমাট অন্ধকার। আলো বলতে পুলিশের হাতের টর্চ দুটো! ওরা পূষণ, মিত্রাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নেহাত জিন্‌স পরেছিল, তাই মিত্রার হাঁটতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু পদে-পদে হোঁচট খাচ্ছেন।

ওরা যখন মঠের কাছে পৌঁছোল, ততক্ষণে পুলিশের তল্লাশি শেষ। রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু দু’জন কনস্টেবলকে পাঠানো হয়েছে পিছনের ঢালে। ওরা দেখে আসবে, ওখানে কোনও বডি পড়ে আছে কি না।

মিত্রা আর পূষণ হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ পূষণের আশা ছিল, এখানেই কোথাও রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ওর কেমন বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সেই লামা ছেলেটা এর মধ্যে ইনভল্‌ভ্‌ড। এখানে দাঁড়িয়েই ছেলেটা সেদিন রিয়ার দিকে অসভ্য ইঙ্গিত করেছিল। এখানে না হলেও, আশেপাশে কোথাও ওদের ঘাঁটি আছে। সেখান থেকে রিয়াকে উদ্ধার করে আনা যাবে। কিন্তু এখন পূষণের মনে হল, এবার সব শেষ।

রাজীববাবু একটা টর্চ চেয়ে নিয়ে নিজেই এদিক-ওদিক আলো ফেলে দেখতে শুরু করলেন। মাঝখানে সেই বিরাট খুঁটিটা, তার মধ্যে

দিয়ে গলানো চাকা। চাকাটার কাছে গিয়ে ভাল করে আলো ফেলে দেখে উনি বললেন, 'নির্মাণ, গুড!"

দেওয়ালের গায়ে বেশ কিছুক্ষণ টর্চ ফেলে তাকিয়ে রইলেন রাজীববাবু। পূষণ দেখল, একটা নীল রঙের বৃত্ত। তার চারপাশে অনেকগুলো পাপড়ি আঁকা। রাজীববাবু প্রত্যেকটা পাপড়ির উপর দিয়ে আলো ঘুরিয়ে এনে, বৃত্তের মাঝখানে ফেললেন। সেখানে একটা কিছু লেখা রয়েছে। উনি বসে পড়ে খুঁটিয়ে লেখাটা দেখলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অং। ফাইন!"

পূষণ বলল, "দরজার মাথায় বজ্র আঁকা আছে।"

"জানি, ভিতরে এসো।"

মেঝেতে সেই চক্রটা আঁকা। রাজীববাবু তার উপর কিছুক্ষণ টর্চ ধরে রেখে বললেন, "একই ছবি। বুঝতে পারছ?"

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসতেই চমকে উঠল ওরা। রাজীববাবু চট করে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার পর উনি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "পাখি।"

টর্চ জ্বেলে খুব দ্রুত এদিক-ওদিক আলো ফেলে রাজীববাবু বললেন, "বেশি দেরি করা যাবে না।"

"কেন?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"যদি ওরা কেউ আসে, তা হলে বাইরে এতগুলো পুলিশ দেখে অ্যালার্ট হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করারও নেই। এখানে একা আসাটা বোকামি হত।"

বাইরে থেকে একজন ভিতরে ঢুকে নেপালিতে কিছু বলতে রাজীববাবু নেপালিতেই উত্তর দিলেন। সে বেরিয়ে গেল। রাজীববাবু বললেন, "ওরা ওদিকের ঢাল খুঁজে এসেছে। কিন্তু কোথাও কোনও বডি পাওয়া যায়নি। ওরা এবার ফিরতে চাইছে।"

রাজীববাবুর পিছন-পিছন পূষণও পাশের ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে একা থাকবে না বলেই মিত্রাও ঢুকল ঘরটায়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পুজো করা হয়েছে। ঘর জুড়ে ধূপ-ধুনোর গন্ধ। চারদিকে প্রচুর ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। রাজীববাবুর টর্চ গিয়ে বিগ্রহের উপর স্থির হল। কালকের সেই ভয়ানক হিংস্রমূর্তি। তাঁর এবং যে নগ্না নারী তাঁর

কোলে উঠে দু'পা দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে রেখেছে, দু'জনের মুখই যেন প্রচণ্ড রাগে গনগন করছে। অন্ধকার রাতে নিভৃত মৈথুনে ব্যাঘাত ঘটানোয় তাঁরা যেন ক্ষিপ্ত।

"বুদ্ধকপাল," নিজের মনেই রাজীববাবু বললেন, "এই মূর্তি কোথাও দেখতে পাবে না। সঙ্গের দেবীর নাম চিত্রসেনা। হেরুকের একটা রকমফের। মেজাজ সবসময় গরম। মুখখানা দেখেছ?"

টর্চ আবার ফিরে এল বুদ্ধকপাল আর চিত্রসেনার উপর। রাজীববাবু বেদির উপর আলো ফেলে বললেন "স্ট্রেঞ্জ! এটা এখানে কেন?"

পূষণ একটু অন্যমনস্ক ছিল, তাই শুনতে পেল না। কিন্তু টর্চ অনুসরণ করে মিত্রা দেখল, বাইরের মতো বেদির নীচেও একইরকম একটা বৃত্ত আঁকা রয়েছে। শুধু বাইরের বৃত্তটা লাল আর এটা হলুদ। এখানে পাপড়িও অনেক কম। ভিতরে আরও দুটো পদ্ম আঁকা। একটা সোজা আর একটা উলটোনো। তার মাঝখানে আবার একটা স্টার অফ ডেভিড। স্টারের মাঝখানে কিছু একটা লেখা আছে। বৃত্তটা ঘিরে নীল রঙের অনেকগুলো তিনমাথা ছোট-ছোট মূর্তি। মূর্তিগুলোর মাঝের মুখটা নীল আর দু'পাশের দুটো সাদা আর লাল। প্রত্যেকেরই ছ'টা করে হাত। তার মধ্যে দু'হাতে একজন করে দেবীকে জড়িয়ে রয়েছে। অন্য চারটি হাতে কী সব যেন রয়েছে!

রাজীববাবু অনেকক্ষণ আলো ফেলে তাঁদের দেখলেন। একটু পরে ওখান থেকে সরে গিয়ে বললেন, "চলো, পিছনটা দেখে আসা যাক।"

অনেক খুঁজেও রিয়ার কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না! তা হলে কি সঞ্জয়ের আশঙ্কাই ঠিক? ওরা বিষণ্ণ পদক্ষেপে নীচে নামতে শুরু করলেন।

মৃগাঙ্ক এতক্ষণ ওদের জন্য আশায়-আশায় তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু সকলকে এভাবে নামতে দেখেই যা বোঝার বুঝে গেলেন।

গাড়িতে ওঠার সময় রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাল ওরা প্রপার্টির ব্যাপারে কথা বলতে আসবে বলেছে?"

মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়লেন।

রাজীববাবু ধরা গলায় বললেন, "এখন ওটুকুই যা ভরসা।"

ফেরার পথে সকলেই চাইছিলেন, যতটা দেরি করে ঢোকা যায়।

কেউ বাড়ি ফিরে অপ্রিয় সত্যিটা জানাতে চাইছিল না। কিন্তু গাড়িটা হুশ করেই ফিরে এল! কাঞ্চন সিনেমা হলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রাজীববাবু সামনের সিটে ঘুষি মেরে বললেন, “একবারও খেয়াল হল না, ছিঃ!”

রাজীববাবুর এহেন আচরণে সকলেই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। উনি ভ্রূক্ষেপ না করে মাথা নাড়তে থাকলেন। কোনও কথা বলছেন না, বারবার ঘড়ি দেখছেন। একটা অদ্ভুত চঞ্চলতা তাঁকে পেয়ে বসল। বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতেই, কাউকে কিছু না বলে উনি নেমে গেলেন।

॥ ১৩ ॥

নদীর ধার ঘেঁষে ওরা চারজন নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিল। গাড়িটা দূরে রেখে ওরা হেঁটে এসেছে। একজনের হাতে একটা কলসি, খুব সাবধানে সেটাকে নিয়ে সে আসছে। চারপাশ অন্ধকার হলেও ওদের টর্চ জ্বালা বারণ। কিন্তু ওদের হাঁটাচলা দেখে বোঝাই যায়, জায়গাটা ওরা হাতের তালুর মতো চেনে। মঠের চাতালে এসে ওরা দেখল মেন গেট বন্ধ। ওরা ঘুরে পিছনে চলে গেল। ওদিকে একটা ছোট দরজা আছে।

পাহাড়ের কোলে এই মঠটা বেশ বড়। প্রচুর টুরিস্ট এখানে আসে। মঠের ভিতরে অনেক ঘর আর নানারকমের সিঁড়ি। কোনওটা উপরে উঠেছে, কোনওটা নীচে নেমেছে। ওরা মাঝখানের বিরাট চক্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার দু'পাশে লম্বা খুঁটিতে অজস্র পতাকা উড়ছে। রাতের অন্ধকারেও পতাকাগুলোর রং বোঝা যায়।

হঠাৎই একটা লোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। দুর্বোধ্য ভাষায় তাদের কিছু জিজ্ঞেস করল এবং ওরাও লোকটার প্রশ্নের উত্তর দিল। তারপর লোকটা ওদের হাত থেকে কলসিটা নিয়ে কিছু বলল এবং ওরা চারজন উঠোনে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে কাউকে প্রণাম করল।

লোকটা ততক্ষণে উঠোনটা আড়াআড়ি পার হয়ে আর-একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার ভিতর টিমটিম করে আলো জ্বলছে। সামনের

বেদিতে কোনও এক দেবতার মূর্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু ইনি বুদ্ধ নন, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। মূর্তির পিছনে খুব জমকালো, ভারী পর্দা আর সামনে ছোট-বড় নানা পাত্রে জল রাখা রয়েছে। ঘরের দেওয়ালের চারপাশে কাচের আলমারি। তার মধ্যে থরে-থরে পুঁথি সাজানো। পর্দার পিছনে খানিকটা ছোট জায়গা। তারপর সিঁড়ি নেমে গিয়েছে।

সাধারণ মানুষ এই মঠে এলে এই মূর্তি পর্যন্ত আসতে পারে। তার পিছনে কী আছে, কেউ জানে না। লোকটা ওই কলসিটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নীচে একটা সরু লম্বা করিডর। সেটা ধরে কিছুটা গেলে বাঁ দিকে আর-একটা ঘর। তার দরজায় নানারকম কারুকার্য করা।

ভিতরে বজ্রধর বসে ছিলেন, পরনে লাল আলখাল্লা। তিনি দেখলেন, একজন এসে কলসিটা ঘরের এক কোণে রেখে দিল। বজ্রধরের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। এটা আনা হয়েছে শিলিগুড়ি থেকে। যজ্ঞডুমুর গাছের নীচে এই কলসিটা রাখা ছিল। তিন রাত এক হাজারবার এর সামনে 'ওঁ নাগ্রা নাগ্রা' জপ করার পর এটা আনা হয়েছে এখানে। আজ উনি একে জাগ্রত করবেন! কাল যখন বজ্রধর স্বয়ম্ভূচক্রে বসবেন, তখন এই মন্ত্রপূত তেল তাঁর কাজে লাগবে। আশা করা যায়, এবার জিনিসটা তাঁর হস্তগত হবে। কলসিটা রেখে বজ্রধরকে প্রণাম করে লোকটা বেরিয়ে গেল।

বজ্রধর আসনে বসে চোখ বুজলেন। তাঁর চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল একটা আলো ঝলমলে চাকতি। তার ঠিক মাঝখানে নীল রঙের 'হুং' লেখা রয়েছে। এবার তিনি চোখের সামনে একটা মৃতদেহ দেখতে পেলেন, যার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে বজ্র বেরিয়ে গিয়েছিল। লোকটা অনেককিছু জেনে ফেলেছিল।

ধ্যানস্থ অবস্থাতেই তাঁর একটু আফশোস হল দেহটার জন্য। পার্টির লোকজন সাতসকালে এসে না পড়লে, বডিটা তুলে আনা যেত! অপঘাতে মারা যাওয়া ব্যক্তির শরীর কাজে লাগানো যেত! বজ্রধর মন ঢেলে দিলেন ওই মৃতদেহে।

বজ্রধর অনুভব করলেন, তাঁর শরীরের বজ্র চাইছে কোমল

পদ্মকে ভেদ করতে। চাই মহাসুখ! কাল রাতে অনুষ্ঠান, তার আগে জিনিসটার খোঁজ নিতে হবে। তারপর তিনিই স্বয়ং হেরুক! মনে-মনে হেরুককে প্রণাম করে, তিনি ঘর ছেড়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। রাত কত হল?

॥ ১৪ ॥

"এই যে তিন মাথাওয়ালা মূর্তিগুলো, এদের নাম যমান্তক। কাল রাতে কিছুতেই খেয়াল হল না!" আফশোসের সুরে বললেন রাজীববাবু।

সকাল ন'টা বাজে। রাজীববাবু, পূষণ, মিত্রা আর ওসি ডঙ্গেল দাঁড়িয়ে রয়েছেন কালকের সেই মঠের ভিতর। গত রাতে বাড়ি ফিরেই রাজীববাবু গৌরীকান্তের ডায়েরিটা নিয়ে পড়েছিলেন। তারপর সাড়ে বারোটা নাগাদ পূষণকে মোবাইলে ফোন করে বলেছিলেন, "শোনো, দিস ইজ় নট দ্য এন্ড। কাল সকালে আবার বেরোব। আমার সঙ্গে ডঙ্গেলের কথা হয়েছে। কাল ও নিজেও থাকবে।"

"কোথায়? কোনও খবর পাওয়া গিয়েছে?" পূষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

"হ্যাঁ, অল্প হলেও এখনও আশার আলো আছে।"

আসলে একটা সূত্র ছিল যেটা রাজীববাবু তখনও খেয়াল করেননি। সকালবেলায় ওই লোকগুলো বাড়ির ব্যাপারে কথা বলতে আসতে পারে, তাই মৃগাঙ্কদের অনুপস্থিত থাকাটা উচিত হবে না। শুধু পূষণ আর মিত্রা রাজীববাবুর সঙ্গে যাবে।

সারারাত রাজীববাবু দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। চোখের সামনে সূত্রটা পড়ে থাকতে দেখেও খেয়াল না করার জন্য নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল তাঁর।

আজও সামনের বেদিতে সেই আগুনে রাগ নিয়ে বুদ্ধকপাল সঙ্গিনী চিত্রসেনাকে নিয়ে বিহারে মত্ত। ঘরভরতি ফুল, ধুনোর গন্ধ। হয় ভোরবেলা কেউ পুজো করেছে, নয় সারা রাত পুজো হয়েছে। যে-ই পুজো করে থাকুক, তার কোনও চিহ্নই এখন নেই।

রাজীববাবুর আঙুল তুলে বেদির নীচটা দেখালেন, "বাইরের চাকার সঙ্গে এর পার্থক্য লক্ষ করেছ? ওটা নীল রঙের পদ্ম, চৌষট্টিটা পাপড়ি আছে, আর এটা তো দেখছই হলুদ। এর পাপড়ি আটটা। এটা হল নেক্সট স্টেজ, ধর্মচক্র। এই মূর্তিগুলো যমান্তকের। চলো, যা বোঝার বোঝা হয়ে গিয়েছে। এবার নেক্সট ডেস্টিনেশন।"

রাজীববাবু ডঙ্গেলকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, এই চত্বরের রাস্তাঘাট কে সবচেয়ে ভাল চেনে। এবার পূর্বদিকে যেতে হবে।

কালকের তুলনায় আজ লোকসংখ্যা কম। ডঙ্গেলের সঙ্গে চারজন সশস্ত্র পুলিশ। তাদের একজনকে দেখিয়ে উনি বললেন, "হি ইজ় সুফল, হি নোজ় দ্য রোড।"

নীচে নামতে-নামতে মিত্রা রাজীববাবুর কান বাঁচিয়ে বলল, "সবটাই ট্যান গেল।"

গাড়িতে উঠেই পূষণ বলল, "আমরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। কী দেখে বুঝলেন, আমাদের পূর্বদিকে যেতে হবে?"

রাজীববাবু এতক্ষণে একটু হাসলেন। তারপর সিটে হেলান দিয়ে বললেন, "বৌদ্ধতন্ত্রের একপাশে রয়েছে নির্বাণ, যার নতুন নাম প্রজ্ঞা আর অন্যদিকে জগৎ সংসার যার নতুন নাম উপায় বা করুণা। যে মুহূর্তে প্রজ্ঞা আর উপায় এক হয়ে যাবে, সেটাই অ্যাবসলিউট ট্রুথ বা পরম সত্য। প্রজ্ঞা নারী এবং তাঁর মেল কাউন্টারপার্ট হলেন উপায়। নারীসত্তার প্রতীক হল পদ্ম বা ঘণ্টা। সমস্ত মনাস্ট্রিতে যত ঘণ্টা বা পদ্ম রয়েছে, সবই সিগনিফাই করছে প্রজ্ঞা। উপায়ের সিম্বল হল বজ্র। বিভিন্নভাবে রিপ্রেজ়েন্ট করা যায়, পদ্ম-বজ্র বা চাঁদ-সূর্য বা আলি-কালি।"

"আলি-কালি কী?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

মিত্রা একটা ছোট্ট হাই তুলল। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। আজ সকাল থেকে আবার দৌড় শুরু হয়েছে। এত হেক্টিক শেডিউল ওর পোষায় না। সেই সঙ্গে রয়েছে রিয়ার জন্য দুশ্চিন্তা। এত গম্ভীর আলোচনা শুনতে-শুনতে ওর চোখ ঢুলে আসছে।

রাজীববাবু বললেন, "আলি মানে স্বরবর্ণ আর কালি মানে

ব্যঞ্জনবর্ণ। নানা রকম বীজমন্ত্রও আছে যেমন, হুং, হ্রীং, বং, লং ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ আসলে প্রজ্ঞা এবং উপায়ের মিলন।”

সামনের গাড়িটা থেমে গেল। তারপর একজন কনস্টেবল নেমে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। ডঙ্গেল সামনের সিট থেকে জিজ্ঞেস করলেন, “হোয়াট হ্যাপেন্‌ড?”

তার সঙ্গে কথা বলে ডঙ্গেল রাজীববাবুকে বললেন, “ও বলছে সামনেই পোংবু গ্রাম। সেখানে নাকি একটা মঠ আছে। ওখানে কি যাওয়া হবে? গেলে গাড়ি এখানে রেখে হেঁটে যেতে হবে।”

রাজীববাবু একটু চিন্তা করলেন। এখানে একবার দেখে নেওয়া দরকার। উনি ডঙ্গেলকে বললেন, সকলের একসঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। বিশেষত পুলিশ দেখে গ্রামের লোক ঘাবড়ে যেতে পারে। বরং গাড়ি আর লোকজন এখানেই থাকুক। দরকার পড়লে ওদের ডেকে নেওয়া হবে।

বেলা প্রায় সোয়া দশটা। একটা স্নিগ্ধ সোনালি রোদ ছড়িয়ে আছে। তাই ঠান্ডাটা বেশ আরামদায়ক। রাস্তার ধারে প্রচুর সূর্যমুখী আর অর্কিড ফুটে রয়েছে।

রাজীববাবু হাঁটতে-হাঁটতেই বললেন, “এই পরম সত্যের দার্শনিক দিকটা হল প্রজ্ঞা এবং করুণার মিলন মানে দুটো অপোজ়িট পোলের এক হওয়া। সেটারই প্র্যাক্টিক্যাল আসপেক্ট হল নারী-পুরুষের মিলন। সেই সত্য যখন পুরুষ তখন তার নাম হেরুক। যখন নারী তখন বজ্রবারাহী!”

মঠে ঢুকে রাজীববাবু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চারদিক দেখতে শুরু করলেন। মাঝখানে বিরাট প্রেয়ার হুইল। ডঙ্গেল তার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলে সেটা ঘুরিয়ে দিল। রাজীববাবু ততক্ষণে উঠে প্রার্থনাকক্ষে ঢুকেছেন। সামনে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। মূর্তির সামনে নানা ধরনের বাতিদান। প্রত্যেকটায় প্রদীপ জ্বলছে। দু’পাশে বড় থেকে ছোট জলভরতি বাটি সাজানো আছে। দেওয়ালে ছবিতে কোথাও বুদ্ধ, কোথাও পরিনির্বাণ, কোথাও বা একটা কচ্ছপ। ছবিগুলো দেখতে-দেখতে একটা ছোট টেবলের উপর লম্বা সরু বাঁশের ফুলদানি চোখে পড়ল। তার গায়ে নকশা খোদাই করা। রাজীববাবু আপনমনে বললেন, “ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।”

টেবলের পিছনের দেওয়ালে একটা বিরাট তংখা টাঙানো। একটা কচ্ছপ, তার পিঠের উপর একটা পেল্লায় পদ্মফুল। পদ্মের মাঝখানে একটা বজ্র। তার উপর একজন যোগী বসে রয়েছেন। তার বুকে একটা হলুদ বৃত্ত আঁকা এবং কপালে আর গলায় দুটো বড়-বড় ফোঁটা। যোগীর মাথার উপর আবার একটা ছোট পদ্ম, তার উপরে আধখানা চাঁদ। চাঁদের মাঝখানে সূর্য। পুরো ছবিটা ঘিরেই নানা দেবদেবীর ছোট-ছোট ছবি।

সেটা দেখিয়ে রাজীববাবু বললেন, "চিনতে পারছ?"

পূষণ ঘাড় নাড়ল, "চাঁদ-সূর্যটা বুঝতে পারছি।"

"মনে আছে, গৌরীকান্ত লিখেছিলেন, 'কূর্ম অবতার হও'। এই সেই কূর্ম অবতার। অর্থাৎ কচ্ছপের মতোই বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নাও, নিজের অন্তরে দ্যাখো।"

পূষণ, মিত্রা আর ডঙ্গেল ঘাড় নাড়ল। পূষণ বলল, "ওই সার্কলগুলোর অর্থ কী?"

রাজীববাবু বললেন, "সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। বৌদ্ধতন্ত্র অনুযায়ী, প্রত্যেকের শরীরে চারটে চক্র আছে। একদম নীচে নির্মাণচক্র, তারপর ধর্মচক্র। এই ছবিতে বুকের মাঝখানে হলদে চাকতিটা দিয়ে ধর্মচক্রকে বোঝানো হয়েছে। সেরকম গলায় আছে সম্ভোগচক্র আর মাথায় মহাসুখচক্র..."

রাজীববাবু হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু ছবিটার নীচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। ছবির একদম তলায় একটা আলাদা বর্গক্ষেত্র। তার ঠিক মাঝখানে আলাদা একটা হালকা হলুদ বৃত্ত। বৃত্তের মধ্যে মুখোমুখি দুটো পদ্ম। তাকে ঘিরে সেই যমান্তকের মূর্তি। মূর্তিগুলো এমনভাবে সাজানো যে, পাশাপাশি আটটা, উপর-নীচ ধরলে আটটা আবার কোনাকুনি ধরলেও আটটা।

রাজীববাবু ভুরু কুঁচকে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চলো, এখানে আর কিছু নেই।"

রওনা দেওয়ার পর তিনি মিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাথায় একটা হাত রাখো।"

মিত্রা হাত রাখতেই উনি মুচকি হেসে বললেন, "মহাসুখচক্র,

রাইট? তার নীচে সম্ভোগচক্র। আর সবচেয়ে নীচে নির্মাণচক্র। প্রথম যে মঠে আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে বাইরে যে চাকতিটা ছিল, সেটা ওই নির্মাণচক্র বোঝাচ্ছিল। এরকম আরও তিনটে জায়গা থাকা উচিত, যেগুলো পরের চক্রগুলো বোঝাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় আছে সেগুলো?"

"বুঝলাম না।" পূষণ বলল।

"প্রথম যে জায়গাটা দেখেছিলে, সেটা নির্মাণচক্র বোঝাচ্ছিল। বাইরের সেই চাকতিটার কথা মনে করো, ভিতরে ধর্মচক্রের ছবি এবং ইস্ট ডিরেকশন দেখিয়েছিল। সুতরাং যে জায়গাটা ধর্মচক্রের জন্য থাকবে, সেখানে এমন কোনও চিহ্ন থাকবে, যেটা বুঝিয়ে দেবে নেক্সট পয়েন্ট মানে সম্ভোগচক্রের জায়গা কোন দিকে। বোঝা গেল?"

"আপনি শিয়োর?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"কাল ফোনে কথা বলার সময় একটা টার্ম কানে এসেছিল, একটা বিশেষ রিচুয়ালের কথা। সেটার ইনার মিনিং মহাসুখচক্র। সেখানে যেতে গেলে তো মাঝের দুটো চক্র পেরোতে হবে।"

পূষণ জানতে চাইল, "আগেরটাতে কী সিম্বল ছিল?"

"ওখানে ধর্মচক্রের পাশে যমান্তকের মূর্তি ছিল। যমান্তক হলেন পূর্বদিকের দেবতা। আমরা কোনও কিছুতে জোর দিতে গেলে, তার নীচে আন্ডারলাইন করি বা দু'-তিনবার সেটা বলি। তেমনই ওখানে কুড়িটা যমান্তকের মূর্তি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, ওরা নিশ্চয়ই পূর্বদিকে জোর দিচ্ছে আর এখানে ছবিটার নীচে ছিল আটটা।"

"তার মানে কী?"

"খুব সম্ভবত দূরত্ব বোঝাচ্ছে। ইউনিটটা কী আমরা জানি না। খুব সম্ভবত কিলোমিটার নয়। ধরে নেওয়া যায়, এই মনাস্ট্রিগুলো যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের কিলোমিটারের কনসেপ্ট ছিল না। হয়তো রাস্তার ধারে কুড়ি রকমের সিগন্যাল ছিল, সেগুলো তো এতদিন পর খুঁজে বের করা অসম্ভব। এনিওয়ে চলো, দেখা যাক।"

"তা হলে এটা কি ধর্মচক্র নয়?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"না, এটা জাস্ট একটা মঠ। ইনসিডেন্টালি এটাও পূর্বদিকেই ডিরেকশন দিচ্ছে।"

পূষণ বলল, "প্রথম মঠে যমান্তকের মূর্তিগুলো বারোটা আর আটটা করে, দুটো সেটে সাজানো ছিল। এরকম কি হতে পারে যে, এক-একটা সেট এক-একটা গ্রাম অথবা মনাস্ট্রি বোঝাচ্ছে?"

"হতে পারে। গুড অবজ়ারভেশন।" রাজীববাবু তারিফ করলেন।

॥ ১৫ ॥

ঘন বাঁশ আর পাইন বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে রাজীববাবু হাঁপাচ্ছিলেন। হাঁটতে-হাঁটতেই পূষণ জিজ্ঞেস করল, "ওটাই কি ধর্মচক্রের জায়গা?"

একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রাজীববাবু বললেন, "চলো দ্যাখা যাক। আগের সব সিম্বল তো সেদিকেই ইন্ডিকেট করছিল।"

একটু আগেই ওরা পেডং-এ পৌঁছেছে। বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। পেডং বাজারের একটা দোকানে কিছু খেয়ে, প্রায় ছয় কিলোমিটার উপরে উঠে সাইলেন্ট ভ্যালির কাছে পৌঁছেছে ওরা। সেখানে গাড়িটা রেখে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার হাঁটার পর দূরে একটা চুড়ো চোখে পড়ল।

রাজীববাবু হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "গৌরীকান্তবাবুর ডায়েরি পড়ার পর একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল। আগের মঠে বাঁশের ফুলদানি দ্যাখার পর অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছে। এটা দেখে নিই। ফেরার সময় গল্পটা বলব।"

"আমরা কোথায় এসেছি?" মিত্রা জানতে চাইল।

"তিঞ্চুলে।" ডঙ্গেল উত্তর দিলেন।

"তিঞ্চুলে?" পূষণ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ইয়েস," ডঙ্গেল ওর ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি বোধহয় কার্শিয়ং-এর কাছে তিঞ্চুলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। দিস ইজ় অলসো তিঞ্চুলে।"

"আই সি," পূষণ বলল।

মিত্রা ওর হাত ধরে বলল, "দ্যাখো।"

পরিষ্কার আকাশ, সামনে ঝকঝক করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মিত্রা আর পূষণ দু'জনেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

হাঁটতে-হাঁটতে ডঙ্গেল আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "ক্যান ইউ সি দ্যাট রোড-লাইক স্ট্রেচ?"

পূষণ বলল, "হ্যাঁ।"

"ওটাই সেই বিখ্যাত সিল্ক রুট, লাসার সঙ্গে ভারতের যোগস্থাপন করেছে।"

"সত্যি?" বলে মিত্রা তাকাল সেদিকে।

"ইয়েস," ডঙ্গেল বলল, "১৯৬২ সালের আগে তিব্বত যাওয়ার জন্য এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা ছিল।"

রাজীববাবু একটু দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নিলেন। সামনেই পাইন ঝোপের পিছনে একটা মনাস্ট্রি দ্যাখা যাচ্ছে। সকলে দল বেঁধে সেদিকে এগিয়ে চলল। জঙ্গলের মধ্যে বলে এখানে লোকজন খুব একটা আসে না। মঠের অবস্থাও ভাল নয়, বেশ ভাঙাচোরা। পাশ দিয়ে একটা পাঁচিল দেওয়া আছে বটে, কিন্তু সেটাও অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। সব মঠের মতো এখানেও একটা প্রেয়ার হুইল রয়েছে। ডঙ্গেল যথারীতি সেটা ঘুরিয়ে দিলেন।

এদিক-ওদিক ঘুরে রাজীববাবু কোনও সূত্রই পেলেন না। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর টেনশনও বাড়ছে। একটা বাজে, একটু আগে যা খাওয়া হয়েছিল, সব হজম হয়ে গিয়েছে। ডঙ্গেল নির্বিকার মুখে রাজীববাবুকে দেখছে।

সঙ্গের পুলিশকর্মীরা ছড়িয়ে রয়েছে। কী খোঁজা হচ্ছে, তা এক রাজীববাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। তা ছাড়া উনি নিজেও নিশ্চিত নন যে, কী ধরনের চিহ্ন এখানে পাওয়া যেতে পারে।

প্রার্থনাকক্ষের বেদিটা ফাঁকা। আগে হয়তো কোনও বিগ্রহ ছিল। কিন্তু এখন সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন ঘরের মধ্যে শুধু স্তূপাকৃত শুকনো ফুল। পূষণ আর মিত্রা দু'জনেই দেওয়ালে আঁকা ধর্মচক্রটা চিনতে পারছে। কিন্তু এরপর কী? ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে রাজীববাবু বেরিয়ে এলেন।

"এবার?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছেড়ে ওর মাথায় এখন আবার রিয়ার চিন্তা ঢুকে পড়েছে।

রাজীববাবু মাথা নাড়লেন, "এটা যেহেতু ধর্মচক্র, নেক্সট ডেস্টিনেশন হওয়া উচিত সম্ভোগচক্র। কিন্তু সেটা কোথায়? কোনও সূত্রই তো দেখছি না। মনে হচ্ছে, এই জায়গাটা পরিত্যক্ত।"

"কী হবে তা হলে?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"জানি না," রাজীববাবু বললেন, "আবার কালিম্পং-এ ফিরে, গোড়া থেকে দেখতে হবে অন্য কোনও সূত্র আছে কি না!"

রাজীববাবুর কথা শুনে পূষণ আর মিত্রা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আরও কিছুক্ষণ দ্যাখার পর রাজীববাবু বললেন, "চলো, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। হাতে বিশেষ সময় নেই।"

পূষণ আর মিত্রা তবু দাঁড়িয়ে রইল। ওদের ফিরতে ইচ্ছে করছে না, হতাশ লাগছে।

"চলো," রাজীববাবু তাড়া দিলেন।

"এখানে সত্যিই কিছু পাওয়া যাবে না?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

রাজীববাবু মাথা নেড়ে ফেরার পথ ধরলেন।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডঙ্গেল তাঁর উদ্দেশে বললেন, "স্যার, ওঁরা আসছেন না। দ্য লেডি ইজ় ক্রায়িং।"

পূষণের কাঁধে মাথা দিয়ে মিত্রা কাঁদছে। কাল সকাল থেকেই ওদের পরিবারের উপর দিয়ে প্রচুর ঝড় গিয়েছে। তবু রাজীববাবুর উপর ভরসা রেখে মিত্রা এবং পূষণ এতদূর এসেছে। এবার যখন রাজীববাবুই বললেন কোনও কিছুর চিহ্ন নেই, তখন মিত্রা নিজেকে সামলাতে পারেনি।

হঠাৎ রাজীববাবুর চোখে পড়ল মঠ ঘিরে থাকা ভাঙা পাঁচিলটার দিকে। এতক্ষণ তিনি খেয়াল করেননি! তিনি আস্তে-আস্তে পাঁচিলটা ধরে পুরো জায়গাটা ঘুরলেন। সব জায়গায় ওগুলো নেই। শুধু উত্তর-পূর্ব কোণের খোলা দিকটাতেই আছে। তিনি দূরে দেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। পরিষ্কার আকাশ বলে দূরে লোকবসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ওদিকেই তিব্বত। একটা মেঘের আস্তরণ এসে রোদটাকে ঢেকে দিতেই ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘাও হঠাৎই কেমন গোমড়া হয়ে গেল।

রাজীববাবু মিত্রা আর পূষণের কাছে এসে বললেন, "চলো।"

এবার উত্তর-পূর্বদিকে যেতে হবে। ইন্ডিকেশন সেরকমই মনে হচ্ছে।”

কান্না থামিয়ে মিত্রা ওঁর দিকে তাকাল।

উনি সস্নেহে ওদের বললেন, “আগে বলা হয়নি। প্রত্যেকটা চক্রের মধ্যে একজন দেবী আছেন। ধর্মচক্রের দেবীর নাম মামকি। আগেরটায় মানে নির্মাণচক্রে ছিলেন লোচনা। তেমনই নেক্সট ডেস্টিনেশন মানে, সম্ভোগচক্রের দেবীর নাম পাণ্ডরা। উনি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের শক্তি। দেখে যাও।”

পাঁচিলটা ভেঙে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যতটা অক্ষত রয়েছে তার উপরে সার বেঁধে ছোট-ছোট ময়ূর বসানো আছে। দুটো করে ময়ূর আর তার মধ্যে পদ্মফুল। পদ্মফুলটা লাল পাথরে তৈরি এবং তাতে ষোলোটা করে পাপড়ি।

“সম্ভোগচক্রে যে পদ্মটা আছে তার পাপড়ির সংখ্যা ষোলো,” রাজীববাবু বললেন, “অমিতাভর প্রতীক হল ময়ূর এবং লাল পদ্ম। এগুলো যে শুধু উত্তর-পূর্ব কোণে বসানো রয়েছে তাই নয়, ময়ূরের ঠোঁটের ডিরেকশনটা দ্যাখো।”

মেঘ সরে যেতেই আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা হেসে উঠল।

গাড়িতে উঠে রাজীববাবু নিজে থেকেই বললেন, “আমি যা বুঝেছি সেটা এবার তোমাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। সিক্রেট সোসাইটি বা গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে তোমাদের কোনও ধারণা আছে?”

মিত্রা আর পূষণ দু'জনেই জানাল, তারা এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না।

রাজীববাবু বললেন, “আমিও খুব বেশি জানি না। তবে এটুকু জানি যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে অনেক দল-উপদল আছে। একা হেরুকের নামেই তিনটে দলের কথা জানা যায়, হেরুকযানী, হেরুকসিদ্ধান্তী আর হেরুকপা। তিব্বতি ভাষায় 'পা' মানে সন্ন্যাসী। এরা কেউ কাউকে দেখতে পারে না। অথচ তিনটে দলই মনে করে, হেরুক থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। হেরুক নানা সময়ে নানা রূপ নিতে পারেন। তাঁর পুজো করলেই নির্বাণ লাভ করা যায়। তাঁর গায়ের রং নীল, গলায় নরমুণ্ড, মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন।”

মিত্রা জিজ্ঞেস করল, "কী ভয়ানক! এর মূর্তি আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি। তোমরাও দেখেছ! সেই যে বুদ্ধকপাল," রাজীববাবু বললেন, "অনেকের ধারণা, ওই গোষ্ঠীগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধারণাটা ভুল। নেপাল, ভুটান এবং তিব্বতের পাহাড়ি অঞ্চলে এরা এখনও অ্যাক্টিভ। এমনিতে এদের চেনা যায় না। এদের নিজস্ব কিছু চিহ্ন আছে যা দিয়ে দলের লোকেরা পরস্পরকে চিনতে পারে। যেমন, বাঁশের ফুলদানির গায়ে বিশেষ ধরনের কারুকার্য বা চায়ের পেয়ালা ধরা, চুমুক দেওয়ার কায়দা, এসব থেকে নাকি চিনতে পারা যায়। আচ্ছা, তোমরা উড্ডীয়ান বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছ?"

মিত্রা, পূষণ, ডঙ্গেল কেউই এই জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত নয়।

রাজীববাবুর বললেন, "বৌদ্ধতান্ত্রিকদের প্রধান জায়গা ছিল চারটে। উড্ডীয়ান, কামরূপ, শ্রীহট্ট আর জলন্ধর। এর মধ্যে তিনটের খোঁজ পাওয়া গেলেও উড্ডীয়ান যে কোথায়, তা আজও জানা যায়নি। সেই উড্ডীয়ানে এক রাজা ছিলেন ইন্দ্রভূতি। তাঁর বোন লক্ষ্মীঙ্করা বেশ কিছু বইপত্র লিখেছিলেন। তাঁর অনুরোধেই নাকি ইন্দ্রভূতি কোনও এক গোষ্ঠীকে নিজের রাজ্যের মধ্যে বিহার তৈরি করার জন্য জায়গা দেন আর লক্ষ্মীঙ্করা বিশেষভাবে তৈরি একটি তামার পদক দেন। সেই সোনার পদকের উপরে লক্ষ্মীঙ্করার লেখা শ্লোক, উড্ডীয়ানের প্রশস্তি, পরিচয় এইসব দেওয়া ছিল। সেই পদকটাও বংশপরম্পরায় হাত বদল হতে-হতে হারিয়ে গিয়েছে। হেরুকের অনুগামী যে ক'টা গোষ্ঠী আছে, তারা বহুদিন ধরে উড্ডীয়ান বলে জায়গাটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউই জানে না সেটা কোথায়।"

"এদের বিশেষত্বটা কী?" ডঙ্গেল জানতে চাইলেন।

"জানি না। যাই হোক, গৌরীকান্ত রায়ও ছিলেন হেরুকের অনুগামী।"

"হেরুকের ফলোয়ার? গৌরীকান্ত রায়?" পূষণ বিশ্বাসই করতে পারছে না।

"ইয়েস। তার প্রমাণ ওঁর ডায়েরির পাতায়-পাতায় ছড়ানো। হয়তো তিনি নিজেও সেই উড্ডীয়ানের খোঁজে ছিলেন। কালিম্পং-এ বাড়ি কেনার পিছনে সম্ভবত এই উদ্দেশ্যই ছিল যে, এখান থেকে

তিব্বত, নেপাল, ভুটানের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে সহজেই যাতায়াত করা যাবে। উনি হয়তো সেটা করতেনও। কিন্তু তাঁর খুনের কারণটা ডায়েরি পড়ে বোঝা যায় না। তবে কিছু একটা যে উনি লুকোতে চাইছেন, সেটা পরিষ্কার। যেমন, ওই *কমলে কুলিশ হেরি ভাতিল শ্রীমুখ*, কমলে কুলিশ মানে পদ্মের মধ্যে বজ্র। অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞা আর উপায়ের সংযোগ। শ্রীমুখ মানে বজ্রবারাহী। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটার অর্থ বোঝা যাচ্ছে না, উনি গোপনীয়তাটা এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন," বলে রাজীববাবু ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বের করলেন।

"আপনি এটা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, সঙ্গে রেখেছি। যদি দরকার লাগে," বলতে-বলতে তিনি একটা পাতা বের করে পূষণকে বললেন, "পড়ো।"

পূষণ পড়তে শুরু করল, "আমার জীবনের উদ্দেশ্য, হত্যা করা, পরদার গমন করা, যা আমাকে দেওয়া হয়নি, তা গ্রহণ করা, মিথ্যে বলা।"

"শুনলে লোকটার সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই হয়, তাই তো? কিন্তু এর মধ্যে অন্য অর্থ লুকিয়ে আছে। হত্যা করা অর্থাৎ এটা বোঝা যে, শরীর সত্য নয়। যা আমাকে দেওয়া হয়নি, মানে হেরুক সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমার নেই তা অর্জন করতে হবে, পরদার গমন মানে টু গো টু বজ্রবারাহী। ক্লিয়ার?"

"এগুলো সব হেরুকপন্থীদের কোড ল্যাঙ্গোয়েজ?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, এগুলো থেকে ওঁর ঝোঁকটা বোঝা যায়," রাজীববাবু মিত্রার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "এখন আর লোকটাকে তেমন খারাপ লাগছে না, কী বলো?"

মিত্রা লাজুক হেসে মাথা নাড়ল।

ওরা এখন চলছে রমিতের দিকেই, যেহেতু ময়ূর আর পদ্মফুলগুলো ওদিকেই ইন্ডিকেট করছিল। রাস্তাটা বেশ সুন্দর, পাহাড়ের গা কেটে উঠে গিয়েছে। উপর থেকে নীচে তাকালেই সবুজের রাশির মধ্যে দিয়ে তিস্তার প্রবাহ দেখা যায়।

"লঙ্গেস্ট ভিউ অফ তিস্তা ইজ় সিন ফ্রম হিয়ার।" ডঙ্গেল বললেন।

মিত্রা একবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। পৌনে তিনটে বাজে। এখনও কোথাও পৌঁছোনো গেল না। একটু পরেই সন্ধে নেমে আসবে। রাজীববাবুর মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে, উনি উদ্বিগ্ন।

"আচ্ছা, আমাদের অ্যানালিসিসটা ঠিক তো? রিয়া অন্য কোনও গোষ্ঠীর হাতে পড়েনি তো?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

পূষণের প্রশ্নটা মিত্রার মাথায়ও ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু ও কিছু বলতে পারছিল না।

রাজীববাবু বললেন, "যদি সেটা হয়, তা হলে আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু কয়েকটা জিনিস দেখে আমার মনে হয়েছে, রিয়া ওদের হাতেই পড়েছে। কাল যখন ফোনে ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে, ওরা কারা, তার জবাবে ওরা কী বলেছিল, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, ওরা বলেছিল হেরুকপা।"

"আর কী বলেছিল?" রাজীববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

পূষণ বলল, "ওরা এমন একটা জিনিস জানতে চাইছে, যার উপর অন্য কারও অধিকার নেই। বলেছিল ওদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।"

"সে কথা ওরা বলেনি," রাজীববাবু ঘাড় নাড়লেন, "বলেছিল, উই হ্যাভ গট আওয়ার উইজ়ডম।"

"একই তো হল!"

"হল না। চিন্তা করো, উই হ্যাভ গট আওয়ার উইজ়ডম। সকাল থেকে এই ব্যাপারে অনেক কথাই বলেছি, ভুলে গেলে? মন দিয়ে ভাবো, উইজ়ডম!"

মিত্রার মুখটা একটু জ্বলে উঠল, "প্রজ্ঞা? তার মানে রিয়াকে ওরা প্রজ্ঞা মনে করছে?"

"সম্ভবত তাই," রাজীববাবু মাথা নাড়লেন, "কথা বলার সময় পাশ থেকে নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে 'স্বয়ম্ভূচক্র' কথাটা আমার কানে এসেছিল। গৌরীকান্তের ডায়েরিতেও স্বয়ম্ভূকুসুম কথাটা ছিল। কুমারী যখন ঋতুমতী অবস্থায় থাকে, তখন তাকে ওদের পরিভাষায় বলা হয় স্বয়ম্ভূকুসুম।"

"সেই জন্যই আপনি আমাকে ওটা জিজ্ঞেস করেছিলেন?" মিত্রা জানতে চাইল।

"ইয়েস। তিনদিনের সাইকেলের শেষদিন ওই মেয়েটিকে নিয়ে একটা বিশেষ রিচুয়াল হয়, যার নাম স্বয়ম্ভূচক্র। তা ছাড়া ওরা তো হেরুকপা নামটা বলেই দিয়েছে।"

"তাই যদি হয়, তা হলে ওরা কোনও একটা গোপন আখড়ায় ওই রিচুয়ালটা করবে। আমরা যাতে সেখানে পৌঁছোতে পারি তার জন্যে তো পথে-পথে ইন্ডিকেশন দিয়ে ফুল ছড়িয়ে রাখবে না।" ঝাঁঝালো গলায় বলল পূষণ।

রাজীববাবু স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "স্বয়ম্ভূচক্র এদের খুব পবিত্র একটা অনুষ্ঠান। ওরা মনে করে, স্বয়ং হেরুক আর বজ্রবারাহী এই অনুষ্ঠান চালনা করেন। হেরুক আর বজ্রবারাহীর মিলন হয় মহাসুখচক্রে। যারা সাধনার অ্যাডভানস্ড স্টেজে পৌঁছেছে, শুধু তারাই এই চক্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেখানে যেতে গেলে, আগের তিনটে স্টেজ পেরোতে হবে। ওরা চারটে জায়গা বেছে নিয়েছে, যেগুলো ওই চারটে চক্রের প্রতীক। একদম আনাড়ি যারা, তাদের সাধনা করতে হবে ওই মঠে, দ্যাট ইজ় নির্মাণচক্র। পুরো সাধনাটাই খুব গোপনে করতে হয়। তাই ওরা চারটে জায়গায় এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, যাতে চট করে কেউ চিনতে না পারে। ওদের নিজেদের লোকেরা একটা করে স্টেজ পার হয় আর চিহ্ন দেখে পরের স্টেজে পৌঁছে যায়।"

"এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?" মিত্রা জানতে চাইল।

"সম্ভোগচক্র খুঁজতে। সেখানে গেলে হয়তো ফাইনাল স্টেজের হদিশ পাওয়া যেতে পারে," বলে রাজীববাবু আবার পূষণের দিকে ফিরলেন, "আমি গত চল্লিশ বছর ধরে এই নিয়ে চর্চা করেছি, তা সত্ত্বেও আমার সিম্বলগুলো লোকেট করতে অসুবিধে হচ্ছে। আগেরটাতেই তো দেখলে! সুতরাং ওরা পথে কোনও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেও, সেটা ধরতে পারা সহজ নয়।"

"আমি কিন্তু সেভাবে বলিনি।" পূষণ নরম গলায় বলল।

"ইট্‌স ওকে। তোমাদের তো কম টেনশন যাচ্ছে না।" রাজীববাবু ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

॥ ১৬ ॥

গাড়ি থামিয়ে ডঙ্গেল বললেন, "দিস ইজ় রমিতে টপ।"

রাজীববাবু নেমে এদিক-ওদিক তাকালেন, কিন্তু পাহাড় আর গাছপালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। এখান থেকে তিস্তাকে সরু ফিতের মতো দেখাচ্ছে। সাড়ে তিনটে বাজে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথা এখনও মেঘে ঢাকা। একটু পরই অন্ধকার নেমে আসবে।

বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরেও কিছু না পেয়ে রাজীববাবু ডঙ্গেলের দিকে তাকালেন, "ওদিকটায় কী আছে?"

সুফল জানাল যে, ওদিকে একটা গ্রাম আছে, সিলেরি গাঁও। ওরা আবার গাড়িতে উঠে বসল। সিলেরি গাঁও কাছেই। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওরা গ্রামে পৌঁছে গেল। পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। গ্রামের লোকেরা যে দিকটা দেখাল, সেদিকে একটা খাদ। ওখানে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। রাজীববাবু বললেন, "দ্যাখো তো, ওখানে চুড়োর মতো কিছু একটা রয়েছে।"

মিত্রা আর পূষণ ভাল করে দেখে বলল, "একটা গম্বুজের মতো লাগছে।"

ডঙ্গেল পাশের একজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সেও নীচের দিকে হাত দেখিয়ে কিছু বলল। রাজীববাবু ওদের ইশারায় আসতে বলে এগোতে শুরু করলেন। পাহাড়ের ধাপ ধরে বেশ কিছুটা নেমে ওঁরা যখন বস্তিতে ঢুকলেন তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে। আলো কমে এসেছে। কিছুটা যেতেই একটা ঘেরা জায়গা পড়ল। তার মধ্যে একটা উঁচু চুড়ো। গেটের ভিতরে পাথরের সাদা ষাঁড়।

পূষণ বলল, "এটা তো শিবমন্দির!"

রাজীববাবু কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখছেন। মূল মন্দিরের সামনে কয়েকজন বসে রয়েছে। ভিতরে কালো

পাথরের বিরাট শিবলিঙ্গের সামনে একজন নেপালি পুরোহিত। মূল মন্দিরের ডান দিকে সার বেঁধে আরও কিছু ছোট-ছোট মন্দির, গণেশ, দুর্গা, রুদ্রভৈরব, কালভৈরব। সেগুলো ছাড়িয়ে একটু দূরে আর-একটা মন্দির। কালো পাথরের দেবতা বাঁ হাতে একটা ফল ধরে আছেন আর ডান হাতে বেজির মতো দেখতে একটা জন্তু। মন্দিরের উপরে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'ওঁ জম্ভলজলেন্দ্রায় স্বাহা'। রাজীববাবুর মুখে এবার একটা তৃপ্তির ছাপ দেখা গেল।

"ইনি একজন বৌদ্ধ দেবতা। এঁর নাম জম্ভল, বেসিক্যালি ইনি ধনরত্নের দেবতা। এঁকে তুষ্ট করতে পারলে, যে বেজিটা তিনি ধরে আছেন, তার মুখ থেকে ধনরত্ন ঝরে পড়ে। আমরা ঠিকঠাকই এগোচ্ছি।"

রাজীববাবু মন্দিরের পিছন দিকটা দেখতে চলে গেলেন। মন্দিরের পিছনে ছোট-ছোট পাথরের ঘর। সব ক'টা ঘরই অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে মনে হল, ওগুলো সম্ভবত ধ্যানকক্ষ। একদম শেষ ঘরটায় প্রদীপ জ্বেলে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। রাজীববাবু তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। রাজীববাবু সরে এসে পূষণের কানে-কানে বললেন, "এই ঘরটা দেখতে পারলে ভাল হত। সিম্বলগুলো খুব প্রমিনেন্ট।"

পূষণ গলা নামিয়ে বলল, "যেমন?"

"গা-হাত-পায়ের গয়নাগাটি তো বটেই, পাশে একটা বজ্রও আছে। গো অ্যান্ড সি।"

পূষণ অবশ্য গেল না। বরং জিজ্ঞেস করল, "এবার কী করবেন?"

"সেটাই তো ভাবছি। লোকটা না বেরোলে ভেরিফাই করার উপায় নেই। চলো, অন্য ঘরগুলো দেখি।"

ঘরগুলো একই রকমের। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। শিবমন্দিরে আরতি হচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজীববাবু এগোলেন মন্দিরের দিকে। আগের চেয়ে দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়েছে।

"মুশকিল হয়ে গেল," রাজীববাবু বিড়বিড় করে বললেন। তারপর জম্ভলের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, "এখানে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই নেই। তা হলে?"

"ইট্স ওকে! তোমাদের তো কম টেনশন যাচ্ছে না।" রাজীববাবু ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

॥ ১৬ ॥

গাড়ি থামিয়ে ডঙ্গেল বললেন, "দিস ইজ় রমিতে টপ।"

রাজীববাবু নেমে এদিক-ওদিক তাকালেন, কিন্তু পাহাড় আর গাছপালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। এখান থেকে তিস্তাকে সরু ফিতের মতো দেখাচ্ছে। সাড়ে তিনটে বাজে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথা এখনও মেঘে ঢাকা। একটু পরই অন্ধকার নেমে আসবে।

বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরেও কিছু না পেয়ে রাজীববাবু ডঙ্গেলের দিকে তাকালেন, "ওদিকটায় কী আছে?"

সুফল জানাল যে, ওদিকে একটা গ্রাম আছে, সিলেরি গাঁও। ওরা আবার গাড়িতে উঠে বসল। সিলেরি গাঁও কাছেই। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওরা গ্রামে পৌঁছে গেল। পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। গ্রামের লোকেরা যে দিকটা দেখাল, সেদিকে একটা খাদ। ওখানে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। রাজীববাবু বললেন, "দ্যাখো তো, ওখানে চুড়োর মতো কিছু একটা রয়েছে।"

মিত্রা আর পূষণ ভাল করে দেখে বলল, "একটা গম্বুজের মতো লাগছে।"

ডঙ্গেল পাশের একজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সেও নীচের দিকে হাত দেখিয়ে কিছু বলল। রাজীববাবু ওদের ইশারায় আসতে বলে এগোতে শুরু করলেন। পাহাড়ের ধাপ ধরে বেশ কিছুটা নেমে ওঁরা যখন বস্তিতে ঢুকলেন তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে। আলো কমে এসেছে। কিছুটা যেতেই একটা ঘেরা জায়গা পড়ল। তার মধ্যে একটা উঁচু চুড়ো। গেটের ভিতরে পাথরের সাদা ষাঁড়।

পূষণ বলল, "এটা তো শিবমন্দির!"

রাজীববাবু কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখছেন। মূল মন্দিরের সামনে কয়েকজন বসে রয়েছে। ভিতরে কালো

পাথরের বিরাট শিবলিঙ্গের সামনে একজন নেপালি পুরোহিত। মূল মন্দিরের ডান দিকে সার বেঁধে আরও কিছু ছোট-ছোট মন্দির, গণেশ, দুর্গা, রুদ্রভৈরব, কালভৈরব। সেগুলো ছাড়িয়ে একটু দূরে আর-একটা মন্দির। কালো পাথরের দেবতা বাঁ হাতে একটা ফল ধরে আছেন আর ডান হাতে বেজির মতো দেখতে একটা জন্তু। মন্দিরের উপরে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'ওঁ জম্ভলজলেন্দ্রায় স্বাহা'। রাজীববাবুর মুখে এবার একটা তৃপ্তির ছাপ দেখা গেল।

"ইনি একজন বৌদ্ধ দেবতা। এঁর নাম জম্ভল, বেসিক্যালি ইনি ধনরত্নের দেবতা। এঁকে তুষ্ট করতে পারলে, যে বেজিটা তিনি ধরে আছেন, তার মুখ থেকে ধনরত্ন ঝরে পড়ে। আমরা ঠিকঠাকই এগোচ্ছি।"

রাজীববাবু মন্দিরের পিছন দিকটা দেখতে চলে গেলেন। মন্দিরের পিছনে ছোট-ছোট পাথরের ঘর। সব ক'টা ঘরই অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে মনে হল, ওগুলো সম্ভবত ধ্যানকক্ষ। একদম শেষ ঘরটায় প্রদীপ জ্বেলে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। রাজীববাবু তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। রাজীববাবু সরে এসে পূষণের কানে-কানে বললেন, "এই ঘরটা দেখতে পারলে ভাল হত। সিম্বলগুলো খুব প্রমিনেন্ট।"

পূষণ গলা নামিয়ে বলল, "যেমন?"

"গা-হাত-পায়ের গয়নাগাটি তো বটেই, পাশে একটা বজ্রও আছে। গো অ্যান্ড সি।"

পূষণ অবশ্য গেল না। বরং জিজ্ঞেস করল, "এবার কী করবেন?"

"সেটাই তো ভাবছি। লোকটা না বেরোলে ভেরিফাই করার উপায় নেই। চলো, অন্য ঘরগুলো দেখি।"

ঘরগুলো একই রকমের। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। শিবমন্দিরে আরতি হচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজীববাবু এগোলেন মন্দিরের দিকে। আগের চেয়ে দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়েছে।

"মুশকিল হয়ে গেল," রাজীববাবু বিড়বিড় করে বললেন। তারপর জম্ভলের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, "এখানে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই নেই। তা হলে?"

মাথা ঠান্ডা রেখে রাজীববাবু ভাবার চেষ্টা করলেন, এরপর কী করবেন? শিবমন্দির হলেও এখানে বৌদ্ধ প্রভাব আছে। কিন্তু এটা যে সম্ভোগচক্র তার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি চোখ বন্ধ করে বিভিন্ন রেফারেন্স মনে করার চেষ্টা করলেন। সংবিৎ ফিরল ধুপধাপ শব্দে। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, মিত্রা ছুটতে-ছুটতে আসছে, পিছনে পূষণ।

"জেঠু, বাঁ দিকে আর-একটা মন্দির আছে। সেখানে মেঝেতে একটা ছবি আঁকা আছে।"

এদিকের মন্দিরটা শিবমন্দিরের বাঁ দিকে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এই মন্দিরে যেতে হলে, শিবমন্দিরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। শিবমন্দিরের ভিতরে গিয়ে পূষণ আর মিত্রা দেখেছে, সব ভক্তই এখানে প্রণাম করে. পাশের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসছে। সেভাবেই ওরা দ্বিতীয় মন্দিরটা দেখতে পেয়েছে।

মেঝেতে একটা আলপনা দেওয়া হয়েছে। মুখোমুখি দুটো সাদা ড্রাগন। দুটো ড্রাগনেরই মাথার উপর একটা করে চাকা। সেই চাকার উপর একটা করে নীল রঙের হাতির মাথা। তাদের উপরে দুটো ময়ূর পেখম তুলে রয়েছে। ময়ূর দুটোর মাথার ঝুঁটির জায়গায় দুটো ছোট সবুজ বুদ্ধমূর্তি। রাজীববাবু হাঁটু মুড়ে বসে, মন দিয়ে ছবিটা দেখলেন। তারপর পূষণের দিকে ফিরে বললেন, "চিনতে পারছ?"

"না।" ভাল করে দেখে পূষণ বলল।

"দেখেছ, ভুলে গিয়েছ। গৌরীকান্ত রায়ের ডায়েরিতে এই আঁকা ছিল। তুমিই আমায় দেখিয়েছিলে।"

"এবার মনে পড়েছে।"

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। বোঝা গেল, আরতি শেষ হয়েছে। এবার হুড়মুড়িয়ে লোক ঢুকবে প্রণাম করতে। বাইরে আবার গুনগুন করে শব্দ শুরু হল। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন। সম্ভবত শান্তিজল! একটু পরেই ঘরে দু'জন লোক ঢুকে, বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল। রাজীববাবু উঠে বিষ্ণুমূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেন। নীল বর্ণের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দু'পাশে দুটো নীল হাতি। একটু তফাতে দুটো ময়ূর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিঠের উপরে একজন দেবী পায়ের উপরে পা তুলে বসে আছেন। তাঁর গায়ের রং লাল, ডান হাত কোলের

উপর মেলা রয়েছে। বাঁ হাত বুকের কাছে। দু'পাশ থেকে দুটো লাল পদ্ম উঠেছে। ষোলোটা করে পাপড়ি, তার উপর বজ্র।

বিষ্ণুর মাথার পিছনে একটা বিরাট চালচিত্র। একটা বৃত্তের গায়ে চারটে পাপড়ি আঁকা। সেটা ঘিরে আর-একটা বৃত্ত। তার গায়ে অনেকগুলো পাপড়ি আঁকা। একদম ভিতরে যে বৃত্তটা, তার ভিতরে সবুজ রঙের একটা হরফ বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এত দূর থেকে ভাল বোঝা যাচ্ছে না। বড় বৃত্তটা ঘিরে একটা বর্গক্ষেত্র। তার প্রত্যেকটা কোণ থেকেই আর-একটা করে মোট চারটে বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে ওই চারটের প্রত্যেকটাতেই নরনারীর মিথুন মূর্তি। এই পুরো ছবিটা ঘিরেই আরও একটা বর্গক্ষেত্র। তার পরিসীমা ধরে ছোট-ছোট অনেকগুলো হলুদ রঙের বরফি। পুরো আলপনাটার নীচে একটা হলুদ রঙের সিংহ। দেখলে মনে হবে, সিংহ যেন পুরো ক্ষেত্রটা পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেটা অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে রাজীববাবু মিত্রাকে ডেকে বললেন, "এদিকে আয়!"

মিত্রা এগিয়ে আসতেই, ওর মাথাটা নিজের বুকে চেপে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, তুই এটা না দেখালে, কোনও রাস্তাই পাওয়া যাচ্ছিল না।"

রাজীববাবুর স্পর্শে এমন কিছু ছিল, যাতে মিত্রার চোখে জল এসে গেল। খানিকক্ষণ তাঁর বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইল মিত্রা। তারপর ধরা গলায় বলল, "রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো জেঠু?"

রাজীববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিষ্ণুমূর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।"

"এটাই কি থার্ড পয়েন্ট?" পূষণ জানতে চাইল।

রাজীববাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ইয়েস, এটাই সম্ভোগচক্র। ওই দেবীর নাম পাণ্ডুরা। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভর শক্তি। পাণ্ডুরা সম্ভোগচক্রের দেবী। ষোলোটা পাপড়িওয়ালা লাল পদ্ম থাকে, যার মধ্যে হুং মন্ত্র থাকে।" বলে তিনি পূষণের দিকে ফিরলেন, "আমার বাড়িতে তোমাকে হুং কথাটার মানে বলেছিলাম, মনে আছে?"

পূষণ ঘাড় নাড়ল।

রাজীববাবু বললেন, "গুড। দ্যাখো, কীভাবে পদ্মটার সঙ্গে বজ্র ব্যবহার করে হুং বুঝিয়েছে।"

"আরে, তাই তো!" পূষণ উচ্ছ্বসিত।

"বিষ্ণু হলেন অক্ষোভ্যের হিন্দু কাউন্টারপার্ট। অক্ষোভ্যের প্রতীক হল হাতি। সাধারণ লোকে একে বিষ্ণুমন্দির ভাববে। বিষ্ণুমন্দিরই, কিন্তু তার মধ্যে চিহ্নের মাধ্যমে নিজেদের কথা জানান দিয়েছে। আর ওই যে চালচিত্রটা, ওটা..." রাজীববাবু থেমে গেলেন। খানিকক্ষণ আগের সেই সন্ন্যাসী এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দেখছে। বিশেষ করে মিত্রাকে। ওর দৃষ্টি মিত্রার উপর। মিত্রার গা শিরশির করে উঠল! ও পূষণের পিছনে সরে দাঁড়াল। লোকটাও সঙ্গে-সঙ্গে নির্লজ্জের মতো এমনভাবে সরে দাঁড়াল যাতে মিত্রাকে দেখতে পায়। পূষণ আর রাজীববাবু লোকটাকে দেখেছেন। দু'জনেরই চোখেমুখে টেনশন। হঠাৎ একই রকম পোশাক পরা আরও দু'জন লোক ভিতরে ঢুকে প্রথম লোকটাকে কিছু জিজ্ঞেস করল। লোকটা তার উত্তর দিতে-দিতে মিত্রার দিকে হাত তুলে দেখাল।

রাজীববাবু চাপা গলায় বললেন, "বেরিয়ে চলো।"

মিত্রাকে মাঝখানে রেখে ওরা দরজার দিকে এগোতেই, দুটো লোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করল।

"পাত্তা দিয়ো না, বেরিয়ে এসো। ওরা বোধহয় কিছু আন্দাজ করেছে!" চাপা গলায় কথাটা বলে, রাজীববাবু এগোতেই দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো একটু সরে গিয়ে যাওয়ার জায়গা করে দিল। রাজীববাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর মিত্রা বেরোতে যেতেই ওরা নিজেদের শরীর দিয়ে দরজা আটকে, মিত্রার দিকে হাত বাড়াল। মিত্রা অস্ফুট আর্তনাদ করে পিছিয়ে যেতে গিয়ে পূষণের পায়ে ধাক্কা খেল। কোনওরকমে পূষণকে ধরে নিজেকে সামলাল মিত্রা। সেই সময় কেউ একজন পূষণের জামার কলার ধরে টেনে সরিয়ে দিল।

ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই বাকি লোকগুলো মিত্রাকে ঘিরে ঠেলতে-ঠেলতে বিষ্ণু মূর্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল! মিত্রা চেঁচিয়ে উঠল, "হোয়াট ইজ় দিস? পূষণ!"

পূষণ এগিয়ে যেতেই ওরা জোরে ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিল।

চিৎকারের আওয়াজ পেয়ে দরজার বাইরে থেকে পুরোহিত মুখ বাড়িয়ে দেখে, নির্লিপ্তস্বরে কিছু একটা বলল। লোকগুলো মিত্রাকে ছেড়ে দিল। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরজার কাছে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

॥ ১৭ ॥

সকাল আটটায় বেরিয়েছে মিত্রা-পূষণ। তারপর থেকেই ওদের আর কোনও খবর নেই। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটা ফোন এসেছিল। জায়গাটার নাম ভাল করে শুনতে পাননি মৃগাঙ্ক। তখন দু'জন সম্ভাব্য খদ্দের এসেছিলেন। তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় জায়গাটার নামটা খেয়াল করেননি। ফোনের নির্দেশ অনুযায়ী কাল রাতেই মোমোর দোকানটায় বলে আসা হয়েছিল। বেলা এগারোটা নাগাদ দু'জন এলেন। ভদ্রমহিলা গার্লস স্কুলের টিচার আর ভদ্রলোকের ব্যাবসা আছে। তিক্তমুখে মৃগাঙ্করা তিনভাই কথা বলতে বসলেন। শুধু রিয়ার নিরাপত্তার জন্যই এঁদের বিরুদ্ধে থানায় যেতে পারছেন না। ওঁরা দু'জন যা বললেন, কিছুই মৃগাঙ্কর মাথায় ঢুকল না। দায়সারাভাবে জবাব দিলেন। টাকাপয়সা নিয়েও ঠিকঠাক কথা বলতে পারলেন না। বেশিরভাগ কথাই বললেন সঞ্জয়। উনিও ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। কাল প্রায় সারারাত বাইরে কাটিয়েছেন। ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে মৃগাঙ্কদের কাছে এসে জানতে পারলেন, মিত্রা আর পূষণ রিয়াকে খুঁজতে রাজীববাবুর সঙ্গে বেরিয়েছে।

সঞ্জয়বাবু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, "তোমাদের কোনও আক্কেল নেই! এই অবস্থার মধ্যে ওদের ছেড়ে দিলে! এখানে কী চেনে ওরা? কোথায় খুঁজবে? রাজীব একটা খ্যাপা লোক, তাঁর সঙ্গে কেউ যায় এভাবে? ওরা যখন গিয়েছে আমি ততক্ষণে ফিরে এসেছি। একবার আমাকে জানাতে পারলে না?"

"আসলে আপনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন," মৃগাঙ্ক আমতা-আমতা করলেন।

"বিশ্রাম করছিলাম বলে তুমি জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে না!

বিশ্রামই যদি নিতাম তবে কাল সারারাত মেয়েটাকে খুঁজে বেড়াতাম না," সঞ্জয়ের গলা ধরে এল, "রাজীব লেখাপড়া নিয়ে থাকে। ও জানে না, এই লোকগুলো কী ভয়ংকর হতে পারে!"

থানার ওসি ওদের সঙ্গে আছেন শুনে সঞ্জয় একটু আশ্বস্ত হলেন। এমন সময় ওই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত হওয়ায় কথাটা আর গড়াল না। মৃগাঙ্ক বলার সুযোগই পেলেন না যে, কাল রাতে তিনিও বেরিয়েছিলেন রাজীববাবুর সঙ্গে।

ঘুরেফিরে দেখার পর ভদ্রমহিলা জানালেন যে, বাড়িটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। বারোটা নাগাদ আরও দু'জন এলেন। ওঁরা যেতে না যেতেই আর-এক পার্টি। দুটো অল্পবয়সি ছেলে, ব্যাবসা করে। সবটাই সঞ্জয় সামলালেন।

বাড়িটা ঘুরে দেখার সময় ছেলে দুটোর কৌতূহলী চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছিল। দিয়াকে দেখে দু'জনেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রিয়ার অন্তর্ধানের পরই দিয়া সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতে যা ঘটছে তাতে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে দুটো উটকো লোক বাড়ি দেখতে এসে, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, ওকে হাঁ করে দেখছে! দিয়া বিরক্ত হয়ে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

মৃগাঙ্করা বুঝলেন, যারা বাড়িটা হাতাতে চাইছে, তারা ভীষণ ধূর্ত! ওরা মৃগাঙ্কদের বাধ্য করেছে ওই দোকানটায় গিয়ে বলে আসতে এবং তার ভিত্তিতেই একের পর এক পার্টি কথা বলতে আসছে। কোনওভাবেই এদের যোগসাজশ প্রমাণ করা যাবে না। এই তিনটে পার্টির মধ্যে শেষ পর্যন্ত যারা বাড়িটা কিনবে, তারা ওদেরই লোক। কিন্তু কথাবার্তা এগিয়ে যাওয়ার পর কোনওভাবেই অভিযোগ আনা যাবে না।

টেনশনের চোটে একবার মৃগাঙ্ক বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছেন তো পরমুহূর্তেই ফোনের কাছে যাচ্ছেন। একবার সবিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বোনকে কী বলবেন, বুঝতে পারছেন না মৃগাঙ্ক। সবিতা কিছুই খাচ্ছেন না। কোনওক্রমে একটু দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটাও তিনি বমি করে ফেলেছেন।

পার্টির দু'জন ছেলে এসে সঞ্জয়কে কিছু জানিয়ে গেল। উনি বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলার পর ক্লান্ত পায়ে চেয়ারে এসে বসে পড়লেন।

"কী হল সঞ্জয়দা?" অভ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

"গতকাল আমার সঙ্গে সঞ্জু আর হিমেশ গিয়েছিল রিয়াকে খুঁজতে। হিমেশের বাইকেই ফিরলাম। আমাকে নামিয়ে ওর বাড়ি যাওয়ার কথা। একটু আগে তিস্তা ব্রিজের কাছে ওর বাইকটা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, সেই সঙ্গে ওর জামাকাপড়। কিন্তু হিমেশ নেই!"

"নেই? নেই মানে?" আতঙ্কিত গলায় মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন।

"মিসিং, পাওয়া যাচ্ছে না!"

মৃগাঙ্ক হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তার আগেই হাঁপাতে-হাঁপাতে কিঙ্কর ঘরে ঢুকল, "বাগানে কারা ঢুকেছে, দিয়া কাঁদছে, ওরা..."

"কোথায়?" সঞ্জয় সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন।

দিয়া ঘরে একাই ছিল। মনের অবস্থা শোচনীয়। রিয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, মিত্রারাও সেই সকালবেলায় বেরিয়েছে। হঠাৎ ও দেখে, জানলা দিয়ে কালো ধোঁয়া ঢুকছে। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই লোক দুটোকে দেখতে পায় দিয়া। ওর ঘরের ঠিক নীচে লোক দুটো আগুন জ্বালিয়ে কী করছিল! দিয়া ওদের দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর গলার আওয়াজ শুনে লোক দুটো ওর দিকে আঙুল নাড়তে-নাড়তে মন্ত্র পড়তে থাকে আর একটা বাটি থেকে সাদা রঙের পদার্থ আগুনে ফেলতে থাকে। দিয়া ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে আসে। এদিকে ওর চিৎকার শুনে কিঙ্কর এসে ওই লোকগুলোকে দেখে, বাইরের ঘরে খবর দিতে এসেছে।

সকলে বাগানে গিয়ে দেখল, লোক দুটো নেই। দিয়ার ঘরের নীচে তিনটে ছোট গর্ত করে, তাতে লাঠি পুঁতে ক্রস করা হয়েছে। তার উপর দিয়ে একটা পাত্র ঝুলিয়ে তাতে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। পোড়া পাত্রটা দেখা যাচ্ছে। হাত না দিয়েও দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আদতে পাত্রটা একটা আধখানা করে কাটা মড়ার খুলি। জানলার ঠিক নীচে পাশাপাশি তিনটে গর্ত করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।

সঞ্জয়ের হুকুমে পুরন ওই তিনটে গর্তের মাটি সরিয়ে ফেলল। দেখা গেল, তিনটে হাঁড়ি বসানো আছে। তাদের মুখটা লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাঁড়ির গায়ে সিঁদুর দিয়ে আঁকিবুকি করা রয়েছে। কাপড় সরাতেই তিনটে হাঁড়ি থেকেই বেরোল জবা আর অপরাজিতার মালা জড়ানো তিনটে কালো বেড়ালের মাথা!

"সঞ্জয়দা, কী হচ্ছে এসব?" কাঁপা গলায় বললেন সুধাংশু।

সঞ্জয় বললেন, "বি স্টেডি। তোমরা এরকম করলে বাড়ির মেয়েরা আরও ভয় পাবে। পুরন এগুলো সরিয়ে দিয়ে এসো।"

পুরন এক পা-ও এগোল না। সোজাসুজি জানিয়ে দিল, ও এতে হাত দেবে না। কালো বেড়ালের মাথা খুব খারাপ জিনিস। এ জিনিস দিয়ে মানুষের ক্ষতি করা হয়। ওদের বস্তিতে অনেকেই জানে।

সঞ্জয় হঠাৎ চটে গিয়ে ওকে বললেন, "গেট আউট। জাস্ট গেট আউট!"

পুরন নির্বিকারভাবে ওখান থেকে চলে গেল।

সঞ্জয় বললেন, "থাক পড়ে। কাল জমাদারকে দিয়ে সাফ করাতে হবে।"

"যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়? বাবা, তুমি আমার কাছে থাকো!" দিয়া কখন নেমে এসেছে ওঁরা খেয়াল করেননি। অভ্রকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল দিয়া।

"কিচ্ছু হবে না। আমরা সকলে রয়েছি। ভয় পাচ্ছিস কেন?" অভ্র মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন।

"তা হলে রিয়াদিকে ধরে নিয়ে গেল কী করে?' দিয়া কাঁদছে, 'তোমরা জানো না, ওই লোকগুলো কোনও জামাকাপড় পরেনি। আমার দিকে কী বিশ্রীভাবে...' ও কথা শেষ করতে পারল না।

সঞ্জয় ততক্ষণে আগুনটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখছেন। তারপরে বললেন, "অভ্র, তুমি কিঙ্কর আর দিয়াকে নিয়ে ওদিকে যাও। সুধাংশু আর মৃগাঙ্ক এদিকে শোনো।'

উনি দেখালেন, যে তিনটে লাঠির আগায় ওই আধখানা খুলি বাঁধা ছিল, সেগুলো লাঠি নয়, তিনটে লম্বা সরু হাড়!

"এই হাড় আর খুলির জন্য থানায় জানাতে হবে। প্লাস লোকগুলো

অশালীন ইঙ্গিত করেছে, তাই তো মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়েছে। এটাও থানায় জানিয়ে রাখা দরকার।”

মৃগাঙ্ক বললেন, “ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি।”

“তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা এখন বাড়িতেই থাকো। আমি তো বেরোচ্ছি, আমিই থানায় জানিয়ে দেব।”

“আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন?” মৃগাঙ্ক বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন।

“হ্যাঁ। কাল আমার মেয়ে হারিয়েছে আর আজ সকাল থেকে আমার ছেলে মিসিং। হিমেশের কথা শুনলে তো! আমাকে তো যেতেই হবে!” বিষণ্ণ গলায় বললেন সঞ্জয়।

মৃগাঙ্ক আবার মিত্রা এবং পূষণের ফোন নম্বর ট্রাই করলেন। কিন্তু দু'জনের ফোনই আউট অফ রিচ। তাঁর মনে হল, সঞ্জয়দার সঙ্গে থানায় গেলেই হয়তো ওদের খবর পাওয়া যেতে পারত। যেহেতু ওসি নিজে ওদের সঙ্গে গিয়েছেন, থানার লোকেদের কাছে ওদের খবর থাকতে পারে। মৃগাঙ্ক ভাবলেন, সঞ্জয়দাকে খবরটা দিয়ে দিলেই হয়। উনি তো থানায় যাবেনই। মৃগাঙ্ক এবার সঞ্জয়ে মোবাইল নম্বর ট্রাই করলেন। কিন্তু একঘেয়ে ধাতব কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল, 'দ্য নম্বর ইউ আর ট্রায়িং টু রিচ ইজ় সুইচ্‌ড অফ!'

একরাশ বিরক্তি নিয়ে মৃগাঙ্ক ঘরে ঢুকলেন। দিয়ার কান্নাকাটির চোটে সকলেই ব্যাপারটা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে। সারা বাড়ির পরিবেশ থমথমে। দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দেওয়া হল। সুনন্দা গিয়ে ঠাকুরঘরে বসে পড়লেন।

সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়টা যেন সকলকে চেপে ধরল। দিয়া কিছুতেই নিজের ঘরে থাকল না। অনি এবেলা কিছুটা সুস্থ। ওর ঘরেই দিয়া আর কিঙ্কর গিয়ে বসল। কেউই কোনো কথা বলছে না। সকলের মনই ভারাক্রান্ত।

হঠাৎই বারান্দার নীচে যেখানে ওই হাঁড়িগুলো পোঁতা আছে, সেখান থেকে একটা খচমচ করে আওয়াজ এল। শব্দটা শুনলেও কেউ কিছু বলল না। আবার সেই খচমচ শব্দ। তিনজনই একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। কিঙ্কর আপনমনেই বলল, “গন্ধ পেয়ে ইঁদুর-টিদুর এসেছে।”

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। বেড়াল ডাকছে। দিয়া শক্ত করে কিঙ্করের হাতটা চেপে ধরল। ডাকটা ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। তারপরই বারান্দার দিকের দরজায় আঁচড়ানোর শব্দ শোনা গেল। ওদিকের দরজা দিয়েই বাথরুমে যেতে হয়।

দিয়া ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই অভ্র আর নীলিমা দৌড়ে এলেন। তাঁরাও শুনলেন বেড়ালের কান্না আর আঁচড়ানোর শব্দ। অভ্র বললেন, "কিছুতেই কেউ জানলা-দরজা খুলবে না। বাথরুম যেতে হবে না। চেপে বসে থাকো।"

বেড়ালটা এরপর সারা বাড়ি ঘিরে ডাকতে শুরু করল আর সেই সঙ্গে চলল দরজা আঁচড়ানো। কিছুক্ষণ পর বেড়ালের ডাক, আঁচড়ানোর শব্দ থেমে গেল। হঠাৎই বাড়ির পিছনের অংশ থেকে অনেক লোকের গলার আওয়াজ ভেসে এল। সুধাংশু আর অভ্রকে ডেকে নিয়ে ছাতে গিয়ে মৃগাঙ্ক দেখলেন, পিছনের বাগানে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ঘিরে সাত-আটটা উলঙ্গ শরীর নাচছে। আর তাদের মাথার উপরে তালে-তালে কয়েকটা পাখি উড়ছে! কী পাখি বোঝা যাচ্ছে না।

গৌরীকান্ত রায়ের পরিত্যক্ত পুজোর ঘরের সামনে উন্মাদের মতো নাচছে লোকগুলো। একটা ভয়ংকর আর্তনাদে ওঁদের সংবিৎ ফিরল। কিঙ্করের গলা না? ওঁরা তড়িঘড়ি নীচের দিকে দৌড়োলেন। সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কিঙ্কর ঠকঠক করে কাঁপছে। উপর থেকেই ওঁরা দেখলেন, সিঁড়ির মাঝামাঝি অংশে তিনটে কালো বেড়ালের বাচ্চা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে।

॥ ১৮ ॥

গাড়ির দিকে যেতে-যেতে ডঙ্গেল বিড়বিড় করে বললেন, শয়তানগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল!"

রাজীববাবু বললেন, "ঠিক কথা, কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই!"

"ইয়েস স্যার" বললেন ডঙ্গেল।

"উনি ওই সময় না এলে কী যে হত!" মিত্রা বলল। উত্তেজনায় ও হাঁপাচ্ছে।

পূষণ বলল, "কিন্তু ওরা হঠাৎ এটা করতে গেল কেন? মিত্রাকে সরিয়ে ফেললেই কি মিটে যেত? আমরা তো পুরোটাই সার্চ করতাম!"

"পারতে কি?" রাজীববাবু বললেন, "ওরা ভেবেছিল আমরা তিনজনই শুধু এসেছি। এবার ভাবো তো, মিত্রাকে আটকে দিলে আমরা দু'জন এখানে কী করতাম? কাউকে চিনি না, লোকবল নেই, কোথায় সার্চ করতাম? কাকে বলতাম? স্থানীয় লোকজনকে ব্যাপারটা বোঝাতেই প্রাণ বেরিয়ে যেত। আর বুঝলেও ওরা কিছুই করত না। কোথায় খুঁজতে ওকে?"

"সেটা অবশ্য ঠিক।" পূষণ বলল।

সিলেরি গাঁওয়ে ফিরে এসে রাজীববাবু বললেন, "ছ'টা বাজে! একটু চা খেলে ভাল হত। সেই সঙ্গে নেক্সট প্ল্যানটাও ছকে নিতে হবে," তারপর মিত্রার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি ঠিক আছ তো? একটু বসলে অসুবিধে নেই তো?"

"না, আমি ঠিক আছি।" মিত্রা বলল।

কাছেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে নুডল্‌স সুপ এবং চায়ের অর্ডার দিয়ে রাজীববাবু বললেন, "মনে হচ্ছে সামনে গিয়ে সাউথে যেতে হবে। মন্দিরে বিষ্ণুর পিছনের চালচিত্রটা মনে আছে? ওখানে যে দুটো ফুল আঁকা ছিল, সে দুটো পদ্ম। ভিতরের পদ্মটায় চারটে পাপড়ি এবং বাইরেরটায় বত্রিশটা। ওটাই আসলে মহাসুখচক্রের চিহ্ন। ওটাই প্রজ্ঞা আর উপায়ের মিলনের জায়গা। সেজন্যই ওর চার কোণে চারটে ছবি ছিল।"

"তার মানে তো ওই জায়গাটাই আমরা খুঁজছি।" মিত্রা এক্সাইটেড হয়ে পড়েছে।

"আমরা খুঁজছি, কিন্তু ওই মন্দিরটা নয়," রাজীববাবু হাসলেন, "ওটা ঘিরে অনেকগুলো হলুদ রঙের বরফি আঁকা ছিল আর নীচে ছিল একটা হলুদ সিংহ। মনে আছে? আসলে মহাসুখচক্রের দেবী হচ্ছেন তারা। তিনি ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির সঙ্গে রিলেটেড। অমোঘসিদ্ধির

রং সবুজ। তারাদেবীরও রং সবুজ। কিন্তু এখানে বর্ডারে রং ছিল হলুদ। খেয়াল করেছ?"

মনে না পড়লেও দু'জনেই বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, হলুদ ছিল।"

"হলুদ হচ্ছে ধ্যানী বুদ্ধ রত্নসম্ভবের চিহ্ন। তাঁর প্রতীক রত্ন আর সিংহ।"

"ইয়েস আই গট ইট!" পূষণ উত্তেজনায় টেবিলে ঘুঁসি মেরেছে, "রত্ন মানে ডায়মন্ড। বরফি!"

"এগজ্যাক্টলি," রাজীববাবু বললেন, "রত্নসম্ভবের ডিরেকশন সাউথ।"

"একটা কথা বলব?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

রাজীববাবু কথা থামিয়ে ওর দিকে তাকালেন। একটু ইতস্তত করে মিত্রা বলল, "আপনি শিয়োর যে, ওই শিবমন্দিরটা আমাদের গন্তব্য নয়? তা হলে ওরা আমাকে ধরে টানাটানি করছিল কেন?"

"হেরুকপাদের গ্রুপটা খুব অর্গানাইজ্‌ড। সব জায়গায় ওদের লোক ছড়ানো আছে। কোথায় তোমাকে হাপিশ করে দিত, টের পাওয়া যেত না। এই দোকানেও কিন্তু ওদের ইনফ্লুয়েন্স আছে।"

"মানে?" পূষণ আর মিত্রা রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছে।

"দেওয়ালে অবলোকিতেশ্বরের ছবিটা লক্ষ করেছ?"

ওঁর কথা শুনে দু'জনেই ঘুরে তাকাল। মাঝারি ফ্রেমে বাঁধানো অবলোকিতেশ্বরের ছবি। ছবিটার দু'পাশে সেই ড্রাগন, হাতি আর ময়ূরের মাথায় বুদ্ধমূর্তি।

"দেখেছ?"

দু'জনই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রাজীববাবু একটু হেসে বললেন, "দরজার পাল্লাদুটো লক্ষ করেছ কি? বেরোনোর সময় দেখো।"

"আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, ওরা ছবিটা এনে লাগিয়েছে। মানেটা জানে না!" মিত্রা বলল।

"তুমি তো কালিম্পং বাজার ঘুরেছ, পেডং বাজারেও কিছুক্ষণ ছিলে, এরকম ছবি তোমার চোখে পড়েছে?"

"খেয়াল করিনি।"

"খেয়াল করলেও পেতে না," রাজীববাবু বললেন, "এই ছবিটা

একটা কথা বলছে। আমি সেই ভাষাটা একটু-আধটু চর্চা করেছি বলেই বলছি, ওটা একটা কথা বলছে।"

"কী বলছে?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"ড্রাগন আর চাকা মানে বৈরোচনের চিহ্ন। যার শক্তির নাম লোচনা, নির্মাণচক্রের দেবী। বৈরোচনের রং সাদা। তার উপর নীল রঙের হাতি মানে অক্ষোভ্য। ধর্মচক্রের দেবী মামকি ওঁর শক্তি। লাল ময়ূর মানে...'

তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পূষণ বলল, "অমিতাভ আর পাণ্ডরা? সম্ভোগচক্র?"

"ভেরি গুড!"

"তার মানে সবুজ বুদ্ধ সিগনিফাই করছে লাস্ট স্টেজটা?"

"ইয়েস! পরপর যেভাবে চক্রগুলো আছে, সেভাবেই ওদের সাজানো হয়েছে।"

"আচ্ছা, তার মানে কি গৌরীকান্ত রায়ও এই গ্রুপটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?"

"ডেফিনিটলি। আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, এই ছবিটা দেখার পর তা মিটে গিয়েছে," বলতে-বলতে উনি ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বের করে, সেই ছবির পাতাটা বের করলেন। ছবিটার পরে খানিকটা গ্যাপ। তারপরে লেখা,

বাঁশের জঙ্গল ছাড়ালে ত্রিকেশীর স্থির জল।

আবার কিছুটা ফাঁক। তারপরে লেখা,

পুণ্য হল দহনদানে, এ জীবন

রাজীববাবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পাতাটার দিকে। কী ভাবছেন কে জানে? চার-পাঁচটা চোয়াড়ে ছেলে এসে দোকানটায় ঢুকল। ছেলেগুলো দোকানে ঢুকেই একবার মিত্রাদের দেখে নিল। একপাশে ডঙ্গেল এবং অন্যান্য পুলিশকর্মীরা বসে আছেন। ছেলেগুলোও সেদিকেও তাকাল। তারপর কাউন্টারের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল। কাউন্টারের ছেলেটাও উত্তর দিল। ছেলেগুলো ওকে কিছু

বলতে, ও বেরিয়ে গেল। ওরা ভিতরে কোনও জায়গা না পেয়ে, দরজার ঠিক বাইরে বসল। রাজীববাবু গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। ওদের দিকে একবার তাকালেন, কিন্তু খেয়াল করলেন না।

এবার আর-একটা চোয়াড়ে গোছের ছেলে এসে কাউন্টারে বসল এবং একদৃষ্টিতে মিত্রাকে দেখতে শুরু করল। মিত্রা অস্বস্তি বোধ করছিল। পূষণকে বলল, "তুমি এদিকটায় এসো, আমি ওপাশে বসি।"

জায়গা চেঞ্জ করার ফলে রাজীববাবুর সংবিৎ ফিরল। উনি বললেন, "কী হল?"

"কিছু না। ইটস ওকে।" মিত্রা বলল।

ডঙ্গেল কিছু আঁচ করে হাঁক পাড়লেন, "ম্যাডাম, এনি প্রবলেম?"

"নো ইটস অলরাইট।"

রাজীববাবু বললেন, "চোখের সামনে ছিল, ধরতে পারিনি!"

মিত্রা চমকে ওঁর দিকে তাকাল। রাজীববাবু আঙুল দিয়ে লেখাটা দেখালেন, *বাঁশের জঙ্গল ছাড়ালে ত্রিকেশীর স্থির জল।*

"কোথায় যেতে হবে, ডায়েরিটাতে তার একটা সূত্র দেওয়া আছে। কেন ধরতে পারলাম না!" আক্ষেপের সুরে বললেন রাজীববাবু।

পূষণ জিজ্ঞেস করল, "সূত্র দেওয়া আছে মানে?"

রাজীববাবু লেখাটা আবার দেখালেন।

"বুঝলাম না।" পূষণ বলল।

রাজীববাবু বললেন, "স্থির জলের রেফারেন্স উনি আগেও দিয়েছিলেন," উনি দ্রুত পাতা উলটে পিছনে চলে গেলেন, "এই যে, জল আসলে স্থির। কোনও ক্ষোভ নেই, অক্ষোভ্য। তার মানে কী? অক্ষোভ্য বুদ্ধ ধর্মচক্রের দেবতা। এবার ত্রিকেশী বললে কী মনে হয়?"

" কেমন ত্রিবেণী-ত্রিবেণী শুনতে লাগে।" মিত্রা বলল।

"রাইট। ত্রিকেশী, কেশ, চুল!"

"তিঞ্চুলে?" পূষণ বলে উঠল। "এটা কীরকম সূত্র? এখানকার তিঞ্চুলের কথা বলছে না আসলটার কথা বলছে, বুঝব কী করে?"

"এটা দেখে," রাজীববাবুর আঙুল গিয়ে স্থির হল, *বাঁশের জঙ্গল ছাড়ালে* লেখাটার উপর। "পেডং শব্দটা এসেছে বাঁশবন থেকেই। জঙ্গলটা বেসিক্যালি বাঁশের..."

রাজীববাবুর কথা থেমে গেল। চায়ের দোকানের ছেলেটা পূষণের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে সোজাসুজি মিত্রাকে দেখা যায়।

"অউর কুছ সাব?"

রাজীববাবু ডায়েরিটা বন্ধ করে মিত্রা আর পূষণের দিকে তাকালেন, ওরা দু'জনেই ঘাড় নেড়ে না বলল।

"ডঙ্গেল, এনিথিং এল্‌স?"

"নো স্যার। উই মাস্ট মুভ নাউ!"

"ইয়েস," রাজীববাবু ছেলেটাকে বললেন, "নেহি। কিতনা হুয়া?"

বিড়বিড় করে হিসেব করতে-করতে ছেলেটা মিত্রার দিকেই তাকিয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে একটা ছেলেকে ডাকল। সে উঠে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। তারও চোখ মিত্রার দিকেই। মিত্রার পরনে জিন্‌স আর ফুলহাতা টপ। ঠান্ডা লাগছে বলে তার উপর এখন একটা সোয়েটার চাপিয়েছে ও। কিন্তু ছেলে দুটোর তাকানোর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে মিত্রার মনে হল, আরও কয়েকটা সোয়েটার-পুলওভার পরা থাকলে ভাল হত।

"ওয়ান ফিফটি।" ছেলেটা কুতকুতে চোখে মিত্রাকে দেখেই চলেছে।

পূষণ দাম মিটিয়ে দিল। বেরোনোর মুখে রাজীববাবু দরজার পাল্লাটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "দ্যাখো।"

পাল্লাতে সেই ষড়কোণের ছবি। ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট লাল চাকতি। তার মাঝখানে একটা সাদা ফোঁটা।

"কর্পূর আর রক্ত। বুঝতে পারছ?" রাজীববাবু পূষণকে বললেন।

॥ ১৯ ॥

ওদের গাড়ির দিকে যেতে দেখে ছেলেগুলো ছটফটিয়ে উঠল। ওদের উপর দায়িত্ব ছিল মেয়েটাকে আটকানোর। কিন্তু এরা যে বেরিয়ে যাচ্ছে! ছেলেগুলো দোকানটার পিছনে চলে গেল, তারপর সেখান

থেকে পাহাড়ের ঢাল ধরে নিল। রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে সময় লাগবে। নীচে নেমেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োল খবরটা দিতে।

সাধক ছোট্ট ঘরটায় বসে ধ্যান করছিলেন। ঘরের ভিতরে, দেওয়ালের এপাশে হেরুক আর বজ্রবারাহীর একটা মিথুন মূর্তি। বজ্রধর বলেছিলেন, "একা সাধনা করার চেয়ে একজন সঙ্গিনীকে নিয়ে করাই ভাল।"

সেসব প্রথম দিকের কথা। তারপর থেকে ও নিজে অনেকদূর এগিয়েছে। উপযুক্ত সঙ্গিনী নিয়ে সাধনাও করেছে। তারপর অনেকদিন কোনও চক্রে বসা হয়নি। বজ্রধর স্বয়ম্ভূচক্রের আয়োজন করেছেন, কিন্তু এই চক্রে ওর ডাক পড়েনি।

আজ মন্দিরে জিন্‌স পরা মেয়েটাকে দূর থেকে দেখেই মনে হয়েছিল, একে পেলে আবার নতুন উদ্যমে নির্বাণলাভের দিকে এগোনো যাবে। সেই জন্যই ওরা অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটার উপরে নজর রাখছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এরা নিছক টুরিস্ট নয়। কোথাও একটা গন্ডগোল আছে। অন্যথায় এরা এখানে এতটা সময় নষ্ট করত না। বিগ্রহের সামনে না বসে, ওরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওরা কিছু খুঁজছিল। কিন্তু সেটা কী?

মেয়েটাকে দেখেই বোঝা যায়, ও সুলক্ষণা, যোগিনী হওয়ার উপযুক্ত। মেয়েটাকে ওরা আটকেও দিয়েছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে যে পুলিশ আছে জানা ছিল না। পুলিশ দেখেই ওরা বিষ্ণুমূর্তির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওদের পিছনে একজনকে লাগানো হয়েছিল। মেয়েটা ত্রিলোকের স্ন্যাকস বারে বসেছে শুনেই, কয়েকটা ছেলেকে ডেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যে করেই হোক মেয়েটাকে আনতে হবে। সঙ্গে পুলিশ আছে তাই বুঝেশুনে এগোতে হবে। মেয়েটাকে কবজা করতে পারলে আবার চক্র সাধনায় বসা যাবে।

হেরুক আর বজ্রবারাহীর ছবির দিকে তাকিয়ে সাধক একমনে বলতে থাকল "ওঁ বুং স্বাহা, ওঁ বুং স্বাহা, ওঁ বুং স্বাহা।"

কাউকে আকর্ষণ করার জন্য এই মন্ত্র পড়া হয়। মেয়েটার নাম জানা থাকলে সুবিধে হত। মন্ত্রের মধ্যে নামটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিত হওয়া যেত। এমন সময় ছেলেগুলো এসে খবর দিল যে, ওরা চলে গিয়েছে।

মুহূর্তের সাধকের দু'চোখ জ্বলে উঠল। ও অভিমানভরে তাকাল হেরুকের দিকে। মেয়েটাকে তা হলে যোগিনী করা হবে না? সাধক ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করল, ওরা কোনদিকে গিয়েছে। একটা ছেলে হাত তুলে দেখিয়ে দিল। সাধক আর কোনও কথা না বলে, একটা ছোট বাক্স খুলে, নোংরা পুঁটলি বের করে আনল। তারপর সেটা নিয়ে বাইরে এসে; ওরা যে-দিকে গিয়েছে, সেদিকে মুখ করে বসল।

এখন অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগেই আরতি শেষ হয়েছে। এখন আর কেউই এই মন্দিরে আসবে না। এলেও অসুবিধে নেই। লোকে জানে, সন্ধেবেলা এখানে নানারকম ক্রিয়া চলে। বিষ্ণুমন্দিরের প্রদীপ থেকে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এসে, জম্ভল মন্দিরের পিছনে বসে ও পুঁটলিটা খুলল। পুঁটলিতে ছিল করবী ফুল, সাদা সর্ষে, গিরগিটির নখ।

একটা ধুনুচির উপর আগুন জ্বেলে সাধক শুকনো করবীফুল, সাদা সর্ষে আর গিরগিটির নখ নিয়ে আহুতি দিতে থাকল। সেই সঙ্গে শুরু হল মন্ত্রপাঠ। একুশবার মন্ত্রোচ্চারণের পর গাড়িটা যেদিকে গিয়েছে, সেদিকে ফিরে ওই আগুনটা ঘুরিয়ে আরতি করতে-করতে বলতে থাকল, "ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রুঃ ক্ষঃ ফট স্বাহা," একুশবার বলার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সাধক। ওই গাড়ির গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে! ছেলেগুলোকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। ও হেরুককে মনে-মনে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। ওই মেয়েটা যদি ওর যোগিনী হয়, তা হলে খুব তাড়াতাড়ি ও সিদ্ধিলাভ করবে।

রাজীববাবুর দেওয়া ডিরেকশন অনুযায়ী ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। এই পাহাড়ি রাস্তায় অন্ধকারে গাড়ি চালানো ভীষণ কঠিন কাজ। রাস্তাটা কোথায় ভাঙা আছে, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। তার উপর এই পাহাড়ি রাস্তায় দুমদাম ধস নামে!

হঠাৎ গাড়িটা একটা বিকট শব্দ করে থেমে গেল। ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে আবার স্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ি চলল না। বার দুয়েক চেষ্টা করার পর ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এল। বনেট খুলে খুটখাট করে নেপালিতে কিছু বলল। ডঙ্গেল ওর সঙ্গে কথা বলে হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর দরজা খুলে নীচে নেমে দাঁড়াল।

বোঝা গেল, গাড়ি বিগড়েছে। রাজীববাবু ঘড়ি দেখলেন রাত আটটা। আরও কিছুক্ষণ খুটখাট করে ড্রাইভার জানাল, গাড়ি চলবে না। বেশ বড় মাপের গন্ডগোল হয়েছে।

রাজীববাবু হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। বিষ্ণুর চালচিত্র আর গৌরীকান্তের ডায়েরি, এই দুটো জিনিস মিলিয়ে নেক্সট স্টেজের কাছাকাছি এসে গিয়েছেন। কিন্তু গাড়িটা এভাবে ডোবাবে, কে জানত?

॥ ২০ ॥

পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট গ্রাম পোনিয়া। টুরিস্টরা এখনও এর খোঁজ পায়নি। কালেভেদ্রে দু'-একজন ট্রেকার ছাড়া, এখানে লোকজন খুব একটা আসে না। এখানে নিশ্চিন্তে রাত্রিবাস করা যায়, কারণ গ্রামের লোকেরা খুবই অতিথিবৎসল। সারা গ্রামে তিনটে দোকান আছে, সপ্তাহে একদিন হাট বসে। গ্রামে অবলোকিতেশ্বরের একটা বড় মন্দির আছে। এটাই গ্রামের একমাত্র মন্দির। অবলোকিতেশ্বর নাকি তাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই মন্দির কখনও বন্ধ হয় না। যে যখন খুশি এখানে আসতে পারে।

রাজীববাবু বলছিলেন, "বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর নির্বাণ লাভ করার মুহূর্তে হঠাৎ শুনতে পেলেন, কারা যেন কাঁদছে। উনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, প্রাণীকুল কাঁদতে-কাঁদতে তাঁকে বলছে, তুমি যদি নির্বাণ লাভ করে শূন্যতায় মিশে যাও, তা হলে আমাদের কে রক্ষা করবে?

"সেই শুনে অবলোকিতেশ্বর ঠিক করলেন, তিনি নির্বাণ লাভ করবেন না। যতক্ষণ না সকলের দুঃখ দূর হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি এই অবস্থাতেই থাকবেন। বুদ্ধত্বের দিকে যে পা বাড়িয়েছিলেন, সেই পা ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সেই পা একমাত্র নির্বাণের দিকেই যেতে পারে, তাই সেটি আর মাটি স্পর্শ করবে না। তিনি তখন সেই পা তুলে এনে, যে পা তখনও মাটি ছুঁয়ে ছিল, তার উপর রেখে নাচের ভঙ্গিতে

দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই থেকে তিনি পাহাড়ের ধারে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, সারা পৃথিবীর উপর নজর রেখেছেন। তাঁর আঠারোটা হাতে পদ্মফুল রয়েছে বলে তাঁর নাম পদ্মনর্তেশ্বর।”

“পদ্মগুলো দ্যাখো,” রাজীববাবু আবার বললেন, “প্রত্যেকটার মাঝখান থেকে একটা করে আধফোটা পদ্ম উঠেছে। পাপড়িগুলো গোনো।”

পূষণ আর মিত্রা গুনে দেখল, বাইরের পদ্মটায় বত্রিশটা এবং ভিতরের আধফোটা পদ্মে চারটে করে পাপড়ি রয়েছে। প্রত্যেকটা পদ্মই সবুজ রঙের।

গাড়িটা কোনওক্রমে সারানো গিয়েছে। এখন রাত পৌনে বারোটা। সিলেরি গাঁওয়ে খাওয়া থকথকে নুডল্‌স সুপ কখন হজম হয়ে গিয়েছে। এখন সম্বল বলতে বিস্কুট আর বাদামভাজা। বোতলে জলের যা অবস্থা, তাতে একটু-একটু করে চুমুক দেওয়া ছাড়া গতি নেই। বেশ ভালই ঠান্ডা পড়েছে। সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

এত রাতে এখানে কেউ নেই। বিরাট ঘরটায় টিমটিম করে প্রদীপ জ্বলছে। সামনের বেদিতে পদ্মনর্তেশ্বরের মূর্তি দেখে রাজীববাবু বললেন, “অবলোকিতেশ্বর কিন্তু বেসিক্যালি অমিতাভের গ্রুপের। ওর পদ্মের রং হওয়া উচিত ছিল লাল। সবুজটা সিগনিফাই করছে অমোঘসিদ্ধি। তার মানে আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি। গৌরীকান্তও এর কথাই বলেছেন।”

“গৌরীকান্ত?” পূষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“ইয়েস, আমি তো এই গ্রামটা চিনতামই না। নামটা শোনার পরই বুঝতে পারলাম। সেই লাইনটা মনে আছে, *পুণ্য করো দহনদানে এ জীবন।*”

পূষণ আর মিত্রা দুজনেই একসঙ্গে বলল, “হ্যাঁ।”

“প্রজ্ঞা আর উপায়ের মিলনের সময় মহাসুখচক্রে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপে সমস্ত মলিনতা পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়ে নতুন জীবন শুরু হয়। এরা গ্রামটার নামের উচ্চারণ করছে পোনিয়্যা। শেষে এন ওয়াই এ আছে। পুণ্য শব্দটা ইংরেজিতে লিখলে, শেষে এন ওয়াই এ আসবে।”

"হোয়াট টু ডু নাউ?" ডঙ্গেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আই অ্যাম নট শিয়োর। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট।" রাজীববাবু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মূর্তিটা দেখলেন। বিগ্রহের দু'পাশে সবুজ রঙের আরও দুই মূর্তি। একই রকম দেখতে। দুটো মূর্তিরই তিনটে করে মুখ। ডান দিকের মুখটা সাদা রঙের। মাঝের মুখটা সবুজ আর বাঁ দিকের মুখটা লাল। ছ'টা হাতের দুটোতে বজ্র আর ঘণ্টা। অন্য দুটোতে চক্র আর তলোয়ার। এক দেবী তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবতা এক হাতে সেই দেবীকে জড়িয়ে রেখে অন্য হাতটা তাঁর ডান স্তনে রেখেছেন। দু'জনেই সম্পূর্ণ নগ্ন। দেবীর নগ্নতাটা প্রকট হলেও, তিনি নিজে একহাতে পুরুষের কোমর জড়িয়ে রেখে অন্য হাতে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছেন। বাকি চার হাতেব দুটোতে পদ্ম আর বজ্র, অন্য দু'হাতে ডমরু আর ঘণ্টা।

"মাই গড! হোয়াট ইজ় দিস?" বিড়বিড় করে বলে ডঙ্গেল অন্যদিকে সরে গেলেন। ওঁর হঠাৎই খেয়াল হয়েছে যে, সঙ্গে মিত্রা রয়েছে। মিত্রার অবশ্য এসবে লজ্জাশরমের বালাই নেই। ও রাজীববাবুকে জিজ্ঞেস করল, "পাশে এরা দু'জন কারা?"

"মেল ফিগারটার নাম বজ্রামৃত," রাজীববাবু উত্তর দিলেন, "আর ফিমেলটা ওর শক্তি। আমরা যে ঠিক জায়গাতে এসেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এবার কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না!"

"এটাই কি সেই মহাসুখচক্রের মন্দির?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই," রাজীববাবু উত্তর দিলেন, "বজ্র আর ঘন্টা মানে নারী-পুরুষের মিলন। বজ্র আর পদ্ম মানেও তাই। আবার চক্র হচ্ছে ফিমেল, তরোয়াল মেল। ঘন্টা আবার নারীর প্রতীক আর ডমরু পুরুষের। আরও দ্যাখো, যে চিহ্ন বা প্রতীকগুলো নারীত্ব বোঝাচ্ছে সেগুলো সব বাঁ দিকের হাতে। মেল ইমেজগুলো সব ডান দিকে। পুরো মূর্তিটা নারী-পুরুষের মিলন বোঝাচ্ছে। মহাসুখচক্রে যেটা হয়ে থাকে।"

আরও খুঁটিয়ে মূর্তিগুলো দেখে রাজীববাবু ঘরের অন্য দিকে চলে গেলেন। দেওয়ালের গায়ে সার-সার তাক, কাচ দিয়ে ঢাকা। তার ভিতরে রঙিন কাপড়ে বাঁধা বই। একদিকে একটা টেবল। তাতে ছোট থেকে বড় জলভরতি পাত্র সাজানো। দেওয়ালে রংবেরঙের তংখা

টাঙানো। রাজীববাবু তংখাগুলোর সামনে দাঁড়ালেন। খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন, "কোনও হিন্টস নেই।"

রাজীববাবুর কথা শুনে মিত্রা-পূষণ পরস্পরের দিকে তাকাল। উনি আবার বেদির সামনে ফিরে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে মেঝের দিকে তাকিয়ে দরজা পর্যন্ত চলে এলেন। মেঝেতে বিভিন্ন আকৃতির আলপনা দেখে রাজীববাবু এটুকু নিশ্চিত হলেন, এটাই সেই বহু প্রতীক্ষিত মহাসুখচক্রের সাধনক্ষেত্র। কিন্তু রিয়া কোথায়?

ডঙ্গেল আর অন্যান্য পুলিশকর্মীরা বাইরের চাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চাতালের উপর একটা প্রার্থনাচক্র। দু'জন কনস্টেবল সেটা ঘোরাচ্ছিল। আকাশটা হঠাৎই খুব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ঝলমলে তারা দেখা যাচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে, তত টেনশন বাড়ছে। রাজীববাবু একবার ঘড়ি দেখলেন। বারোটা বেজে গিয়েছে।

চাতালটা ঘিরে লোহার উঁচু রেলিং দেওয়া রয়েছে। পিছন দিকে গিয়ে দেখা গেল, একপাশে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। নীচ থেকে একটা অস্পষ্ট গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে, যেন অনেক লোক গান গাইছে। ডঙ্গেলের অভিজ্ঞ কান কোনও ভুল করল না। উনি আর-একবার ভাল করে শুনে রাজীববাবুকে বললেন, "স্যার, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ় সামথিং ডাউনস্টেয়ার্স। সাম প্রেয়ার অর সামথিং।"

মিত্রা আর পূষণ প্রায় দৌড়েই ওপাশটায় গেল। কান খাড়া করে শুনলে আওয়াজটা বোঝা যায়। একটানা গুনগুনানি। ওরা সকলে পা টিপে-টিপে নীচে নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা নীচে নেমেই চলেছে। খানিকটা নামার পর সিঁড়িটা সরু হয়ে গেল। একপাশে পাথরের দেওয়াল আর অন্যদিকে রেলিং। কেউ একজন টর্চ জ্বেলেছিল। ডঙ্গেল ধমক দিয়ে আলো নেভাতে বললেন। আলো দেখলে নীচের লোকগুলো সাবধান হয়ে যেতে পারে। শব্দটা ধরেই ওরা এগোচ্ছে। ওটা বন্ধ হয়ে গেলে এগোনোর জায়গা নেই।

সিঁড়িটা প্রায় তিনতলা নেমে শেষ হল। বাইরে থেকে একটা জলের কুলকুল শব্দ আসছে। সম্ভবত বাইরেই কোনও ঝরনা আছে। হঠাৎ

ইঁক করে একটা শব্দ এল। তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর অনেকগুলো মেয়ে একসঙ্গে কিছু বলে চেঁচিয়ে উঠল। আবার সব চুপ। আর কোনও শব্দই আসছে না।

"আওয়াজটা ওদিক থেকে এসেছে," ডঙ্গেল বললেন।

রাজীববাবু বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে। লেট্স গো দেয়ার।"

ওদিকটায় আর-একটা চাতাল। পাহাড়ের গা খানিকটা কেটে ভিতরে ঢোকানো হয়েছে। মাথার উপরে পাহাড়টা ঝুঁকে এসে আকাশ ঢেকে দিয়েছে। একটু এগোলেই একটা ঘরের মতো দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে আলো আসছে। এখানে জলের শব্দটা ভাল মতোই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওই মন্ত্র পড়ার শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এখন সব চুপচাপ। কোনও আলো না জ্বেলে ওরা ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। ডঙ্গেলের ডান হাতে রিভলবার। সঙ্গের পুলিশরাও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে।

চাতালটা খুব পিছল। ওরা যখন চাতালের মাঝামাঝি পৌঁছেছে তখন আর-একটা জোরালো আওয়াজ ভেসে এল। ওরা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ। ঘরের সামনে পৌঁছোতে গুনগুন শব্দটা আবার শোনা গেল। ডঙ্গেল নিজের লোকজনকে চাপা গলায় কিছু বুঝিয়ে দিয়ে, নিজে এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে, সামনের চারটে সিঁড়ি টপকে ঢুকলেন। পিছন-পিছন পূষণ, মিত্রা আর রাজীববাবু।

সামনের বেদিতে একটা ছড়ানো পদ্ম। সম্ভবত পাথরের, তার উপর বজ্র। বজ্রের উপরে লাল ধ্যানস্থ মূর্তি যার একহাতে বজ্র অন্য হাতে ঘন্টা। বেদিটার উপরে, নীচে, মূর্তিটাকে ঘিরে অজস্র প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের সারি যেখান থেকে শুরু হয়েছে, তার ঠিক আগে আর-একটা সারিতে একইরকম দেখতে কয়েকটা পাত্রে জল ভরা রয়েছে। প্রত্যেকটা পাত্রে পদ্মের পাপড়ি ভাসছে। শব্দটা এখন থেমে গিয়েছে। একটা ঘড়ির টিকটিক শব্দ আসছে শুধু।

"উড্ডীয়ান লোকেশ্বর," নিজের মনেই রাজীববাবু বললেন। ওঁর ভুরু কুঁচকে রয়েছে, "আর তো কোনও ঘর নেই বলেই মনে হচ্ছে। তা হলে শব্দটা আসছে কোথা থেকে?"

উনি ঘরটা ঘুরে দেখতে শুরু করলেন। পূষণ ওঁর পাশে গিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "উড্ডীয়ান লোকেশ্বর মানে?"

"আ পার্টিকুলার ফর্ম অফ অবলোকিতেশ্বর," রাজীববাবু উত্তর দিলেন, "উড্ডীয়ানের কথা বলছিলাম না? সেখানকার তান্ত্রিকরাই এই রূপটা সৃষ্টি করেছিল। তাই এরকম নাম।"

"তাই?"

"হ্যাঁ!" রাজীববাবু একটা টেবলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। টেবলটার উপরে কাচের শোকেসের মধ্যে সারি-সারি পাত্র সাজানো রয়েছে। মাথার খুলি কেটে অর্ধেক করা।

"একেই বলে কপাল," রাজীববাবু আর-একটা টেবলের কাছে দাঁড়ালেন।

"কেন?" মিত্রা উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কপাল কেন?"

"যেহেতু খুলি কেটে অর্ধেক করে নিয়ে, কপাল থেকে মাথার অংশটা পাত্র হিসেবে ইউজ় করে, সেজন্য একে কপাল বলে..."

উনি থেমে গেলেন। সামনে যে শোকেসটা রয়েছে তার মধ্যে লাল ত্রিভুজ আঁকা। আর ত্রিভুজের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট বাচ্চার খুলি। সাদা দাঁত বেরিয়ে রয়েছে।

আলো-আঁধারির মধ্যে ওই খুলিটা দেখে, মিত্রা শক্ত করে পূষণের হাত জড়িয়ে ধরল। জিনিসটা দেখে রাজীববাবুর কপালে ভাঁজ পড়েছে।

"এটা মারাত্মক জিনিস। তিব্বতিতে এর নাম নাল-থড। এটা একটা মেয়ের খুলি। এরকম খুলিতে নাকি সাংঘাতিক ক্ষমতা থাকে। সরে এসো ওখান থেকে।" রাজীববাবু নিজেই শিউরে ওখান থেকে সরে ডঙ্গেলের সামনে দাঁড়ালেন।

"ডঙ্গেল উই মাস্ট বি ভেরি কশাস। দিজ় পিপল আর এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস।"

"এটা যে মেয়ের খুলি আপনি বুঝলেন কী করে?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"ত্রিভুজটা দেখে। ত্রিভুজটা যেহেতু মেল, ওর ভিতরে যা থাকবে, তাকে ফিমেল হতেই হবে। হেরুকপাদের সমস্ত সিম্বল, সমস্ত

দেবতা হয় পাঁচটা ধ্যানী বুদ্ধ বোঝায়, না হলে প্রজ্ঞা আর উপায়ের ইউনিফিকেশন," বলতে-বলতে রাজীববাবু টর্চ ফেলে ঘরটা ভাল করে দেখতে থাকলেন। ঘরের অন্য টেবলের উপর কাচের বাক্সে পাঁচরকম চুড়ি, মালা, হাতের বালা রয়েছে।

"মেয়েটার জন্য চিন্তা হচ্ছে। এসব জিনিস যারা হ্যান্ডল করে তারা..." রাজীববাবু কথা শেষ করলেন না। একটা দেওয়ালের সামনে দাঁড়ালেন। পেল্লায় একটা তংখা টাঙানো রয়েছে। একটা সাদা বৃত্তের মধ্যে লাল দেবীমূর্তি। ডান হাতে বজ্র আর বাঁ হাতে ওই কপাল নামের পাত্রটা। দেবীর আলুথালু চুল। পায়ের নীচে বাঘছাল পরা মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

বৃত্তটা ঘিরে চারটে পাপড়ি। প্রত্যেকটা পাপড়িতে একটা করে দাঁড়ানো মিথুনমূর্তি। এই বৃত্তটা ঘিরে আবার একটা বর্গক্ষেত্র। তার চারটে কোণে চারটে লুপ এবং প্রত্যেকটা লুপে একটা করে শুয়োরের মুখ।

"ইনি বজ্রবারাহী, হেরুকপাদের প্রধান দেবী," রাজীববাবু বললেন, "কিন্তু আসল জায়গাটা কোথায়?"

ঘরের কোণে একটা বড় কালো কাঠের বাক্স লম্বালম্বি দাঁড় করানো রয়েছে। ঢাকনাটা খোলা। ভিতরে একটা সাদা ফ্রেমের মধ্যে একটা ঘড়ি টিকটিক করে চলেছে। দেখে মনে হয় সোনার। আর যে ফ্রেমটা রয়েছে, সেটা কী ওরা বুঝতে পারছিল না।

রাজীববাবু বললেন, "ওগুলো পায়ের হাড়। হাঁটু থেকে চেটো অবধি। এই হাড় এক-একটাই ভীষণ পাওয়ারফুল। এখানে চারটে রেখে দিয়েছে! আর ওই যেটা রয়েছে সেটাও সাংঘাতিক।"

আর-একটা খুলির দিকে তাকিয়ে বললেন রাজীববাবু।

খুলিটার কপালের উপরে পরপর ন'টা গর্ত। এক ঝলক দেখে মনে হয় খুলিটা যেন দাঁত বের করে হাসছে।

"এটার নাম চু-সে-তেই।" রাজীববাবু বললেন।

পুরো ঘরটাতেই এমন একটা বীভৎসতা ছড়ানো। মিত্রার ইচ্ছে হচ্ছিল, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু বাইরেও যেতে সাহস হচ্ছিল না। ও পূষণের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজীববাবুর মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল, "রিয়ার জন্য চিন্তা হচ্ছে। সরে এসো, এসব জিনিসের কাছে না থাকাই ভাল।"

রাজীববাবুর কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের মধ্যে কেউ আর্তনাদ করে উঠল। পরমুহূর্তেই মিত্রার মনে হল, ওর পা-টা কেউ জড়িয়ে ধরেছে।

"ও মাগো!" বলে মিত্রা চেঁচিয়ে উঠে পূষণকে আঁকড়ে ধরে পা ঝাড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই আর্তনাদ।

ডঙ্গেল টর্চ মারলেন নীচের দিকে। একটা লালচে কুকুরছানা। সারা গায়ে ঝুপসি লোম আর তার উপর সাদা-সাদা ছোপ। রাজীববাবু না দেখে ওর গায়ে পা ফেলেছিলেন। কুকুরটা একটা কোণের দিকে সরে গিয়ে গরগর করছে। ডঙ্গেল ওর মুখে টর্চ মারতেই ওটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, তারপর ল্যাজটা পেটের নীচে গুটিয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ডঙ্গেল মিত্রার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "কুল, ম্যাম কুল।"

সঙ্গে-সঙ্গেই আবার সারা ঘর জুড়ে একটা গোঙানির শব্দ উঠতে থাকল। এবার ডঙ্গেলও চমকে গেলেন। মিত্রা শক্ত করে পূষণের হাতটা চেপে ধরল। রাজীববাবুও ওদের কাছে সরে এসেছেন। গোঙানিটা কিছুক্ষণ চলার পরে মনে হল, ওপাশের দেওয়ালের দিক থেকে আসছে।

রাজীববাবু সেদিকে আলো ফেললেন। মুহূর্তের মধ্যে শব্দটা থেমে গেল এবং এত তাড়াতাড়ি থেমে গেল যে, ওরা বুঝতেই পারল না কী হচ্ছে।

আবার সেই গুনগুন শব্দ শুরু হল।

"দেয়ার মাস্ট বি সাম আদার রুম! বাট হোয়্যার ইজ ইট?" ডঙ্গেল বিড়বিড় করে উলটোদিকের দেওয়ালে আলো ফেললেন। কোথাও কোনও ঘর বা দরজার চিহ্ন নেই। নিরেট ফাঁকা দেওয়ালে একটা তংখা টাঙানো। একটা বর্গক্ষেত্র। তার চার কোণে চারটে বৃত্ত। বর্গক্ষেত্রটায় দাঁড়িয়ে আছেন একজন যোগী। তাঁর শরীরের চারটে অংশে চারটে ছোট-ছোট চাকতি। লাল, নীল হলুদ আর সবুজ। পাশের বৃত্তগুলোও লাল নীল হলুদ সবুজ রঙের। চারটে বৃত্তে চার রকম ছবি। চার বৃত্তের মধ্যে নারী-পুরুষের ছবি রয়েছে।

"এই চারটে ছবি আসলে সাধনার চারটে স্টেজ। মাঝের ছবিতে যোগীর শরীরে চাকতিগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? নির্মাণ, ধর্ম, সম্ভোগ ও মহাসুখচক্র। আরে এটা কী? আশ্চর্য তো!"

মাঝখানে যোগীর ছবিটার উপরে রাজীববাবু আলো ফেলেছেন। যোগী যে বেদিটার উপর দাঁড়িয়ে, তার ঠিক নীচে আর-একটা বেদিতে পদ্মনর্তেশ্বরের ছবি।

"তাড়াতাড়ি এসো, উপরে যেতে হবে। কুইক!" বলেই রাজীববাবু হনহন করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে পূষণ ঘড়ি দেখল, রাত একটা।

আবার সেই প্রার্থনা কক্ষ। রাজীববাবু সোজা পদ্মনর্তেশ্বরের বেদির পিছনে টাঙানো পরদার আড়ালে চলে গেলেন। পিছন-পিছন বাকিরাও। নীচে নামার আর-একটা সিঁড়ি।

সিঁড়িটা শেষ হয়ে একটা সরু করিডোর। দু'পাশের দেওয়ালে নানা রকমের ছবি। পশুপাখি থেকে শুরু করে মিথুনমূর্তিও। তারপর আবার দেওয়াল। এখানেও সেই গুনগুন শব্দটা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোনওদিকে কোনও ঘর বা রাস্তা কিছুই নেই। রাজীববাবু থমকে গেলেন।

পূষণ বলল "এবার?"

উনি মাথা নাড়লেন," জানি না।"

"আমরা এখানে এলাম কেন?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"ওই ছবিটা দেখে। যোগীর পায়ের নীচে পদ্মনর্তেশ্বরের যে ছবিটা ছিল, সেটা তোমরা ভাল করে খেয়াল করেছ কি? করলে বুঝতে পারতে, বাইরে যে মূর্তিটা রয়েছে, ওই ছবিটা ওটার রেপ্লিকা। রং, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, বেদির ডিজ়াইন সব একদম এক। এমনকী পিছনে পরদাটা পর্যন্ত একই রঙে আঁকা। যখন দেখলাম যে, যোগীর পা দুটো ওই মূর্তির পিছনে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, আমার মনে হল, হয়তো এই মূর্তিটার পিছনে আসতে বলছে। তারপর তো দেখছই।"

কথা বলতে-বলতেই রাজীববাবু দেওয়ালটা পরীক্ষা করলেন। ডঙ্গেল দেওয়ালে টোকা মেরে, ঠোঁট উলটে ঘাড় নাড়লেন। তারপর একটা ছবিতে আলো ফেলে বললেন, "সি দিস! হাউ ফানি!"

নীলরঙের এক দেবতা ভয়ংকর মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর

ডান হাতে বজ্র আর বাঁ হাতে পদ্ম। গলায় নরমুণ্ডের মালা। বাঁ পা সামনে আর ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ হয়ে পিছনে। বাঁ পায়ের নীচে গণেশ পড়ে রয়েছে।

"এর নাম বিঘ্নান্তক," রাজীববাবু বললেন, "ওই যে উড্ডীয়ানের কথা বলছিলাম, সেখানে এক যোগী সাধনায় বসেছিল। তখন গণেশ নাকি নানাভাবে তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে যোগী এই দেবতাকে আহ্বান করেন। ইনি এসে গণেশকে পরাজিত করেন এবং সেই যোগী নির্বিঘ্নে সাধনায় বসে, সিদ্ধিলাভ করেন। সেই থেকে বৌদ্ধতন্ত্রে গণেশকে যাবতীয় বিঘ্নের উৎস মনে করা হয় এবং ইনি বিঘ্নান্তক। বিঘ্ন দূর করে সাধনার পথ সাফ করেন। সেই হিসেবে ইনি হচ্ছেন সাধকের দ্বারপাল।"

আচমকা উনি থেমে গেলেন। ভুরু কুঁচকে কী চিন্তা করলেন। কান খাড়া করে ওই গুনগুন শব্দটা শুনলেন। তারপরে ডঙ্গেলকে ডেকে ওই বিঘ্নান্তক দেখিয়ে বললেন, "এখানে একটা দরজা থাকার কথা। হি ইজ় সাপোজ়ড টু বি দ্য ডোরকিপার।"

॥ ২১ ॥

ঘরের মেঝেতে বিরাট একটা বৃত্ত। তার চারপাশে রংবেরঙের নকশা আঁকা। বৃত্তটা ঘিরে একটা চতুষ্কোণ। তার চারটে বাহুর প্রত্যেকটার ঠিক মাঝখানে একটা করে দরজা আঁকা। প্রত্যেকটা দরজার দুপাশে দুটো করে মোট আটটা কলসি রাখা হয়েছে। প্রতিটা কলসির মুখ মাটির পাত্র দিয়ে ঢেকে কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছে। তার উপরে তিনটে করে জবাফুল। বৃত্তটার ভিতরে একটা পেল্লায় আট পাপড়িওয়ালা পদ্মফুল আঁকা। পদ্মের ভিতরে একটা সাদা খুলি আঁকা রয়েছে। তার উপরে একটা হাড়ের তৈরি বজ্র রাখা হয়েছে। চতুষ্কোণটার উত্তরদিকে একটা সাপ আঁকা, দক্ষিণে একটা ঢোল, পূর্বদিকে রয়েছে তলোয়ারের ছবি আর পশ্চিমদিকে কচ্ছপের। উত্তর-পূর্বে সিংহের ছবি। সিংহের কোনাকুনি উলটোদিকে মানে দক্ষিণ-পশ্চিমে চক্র। দক্ষিণ-পূর্বে আর

উত্তর-পশ্চিমে যথাক্রমে একটা সাধু আর বজ্রের ছবি। বেশ কিছু প্রদীপ জ্বলছে। তাতে যেটুকু আলো হয়েছে। অবশ্য স্বয়ম্ভূচক্র অল্প আলোতেই হওয়ার কথা।

এর বাইরে একটা সাজানো সিংহাসনে রিয়া বসে আছে। সম্ভবত খুব কড়া কোনও ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে। ওর মাথাটা একপাশে ঝুলে রয়েছে, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে কোথাও ও ভাসছে। সিংহাসনের পাশে আর-একটা ছোট বৃত্ত। তার মধ্যেও নানা নকশা আঁকা। তার ঠিক মাঝখানে লালচে আলো নিয়ে হরি-হরি-হরি বাহনোদ্ভব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আজ লাল আলোর আভা আগের চেয়ে উজ্জ্বল।

রিয়ার পায়ের কাছে বজ্রধর বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা থালায় জবা আর অপরাজিতা ফুল। পাশে কোষাকুষিতে জল আর মড়ার খুলি কেটে তৈরি কপালে মদ রয়েছে।

"ওঁ দেবা পিচুবজ্র হুম হুম হুম ফট স্বাহা," বলতে-বলতে বজ্রধর একটা করে ফুল মদে ডুবিয়ে রিয়ার পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন আর মাঝে মাঝে পাত্রটা তুলে চুমুক দিচ্ছেন। অনেকক্ষণ এভাবে ফুল দেওয়ার পরে তিনি বললেন, "ওঁ আঃ হুম," তারপর বাকি মদটা রিয়ার পায়ে ঢেলে দিয়ে, কপালটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বজ্রধর রাজকীয় পদক্ষেপে ওই বৃত্তটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। এবার চক্র শুরু হবে। এখন তিনি স্বয়ং হেরুক। তিনি নিচু হয়ে ওই বজ্রটা তুলে নিলেন, অন্য হাতে ওই পাত্রটা রয়েছে। সব দেখে পদ্মফুলের মধ্যে আঁকা খুলিটার উপরে বাঁ পা-টা রাখলেন। তারপর ডান পা ঘুরিয়ে বাঁ পায়ের উপরে রেখে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন, এর নাম অর্ধপর্যঙ্ক নাট্যাসন। করা মোটে সহজ নয়, কিন্তু তাঁর অভ্যেস আছে। প্রস্তুত হয়ে তিনি সিংহনাদ করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে আটজন যুবতী ঢুকে এসে বৃত্তটা ঘিরে দাঁড়াল। তাদের হাতে রক্তমাখানো অপরাজিতা ফুল। বজ্রধর হুঙ্কার দিলেন, "হ্রীং হ্রীং।"

সেই নাদ শুনে ঘোরের মধ্যেও রিয়া কেঁপে উঠল। ওই যুবতীদের মধ্যে একজন বৃত্তের ভিতরে ঢুকে এল। বজ্রধর তাকে দু'হাতে জড়িয়ে

ধরলেন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর সেই যুবতীকে ছেড়ে দিতে, সে একপাশে এসে দাঁড়াল। পরের জন ঢুকে এল। এভাবে আটজনের পালা শেষ হওয়ার পর, ওরা প্রত্যেকে ওই বৃত্তের মধ্যে বসে পড়ল। বজ্রধর আবার হুংকার দিলেন, "ওঁ ত্রৈলোক্যক্ষেপ হুম হুম হুম ফট স্বাহা।"

যেহেতু তিনিই এখন হেরুক এবং তাঁর দুটো হাত, তাই এই মন্ত্র। হুংকার শুনেই আটজন পুরুষ বৃত্তের মধ্যে ঢুকে এল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে কৌটো। নারী ও পুরুষরা পরস্পরকে ছুঁয়ে রইল। একসময় নীরবতা ভেঙে বজ্রধর বললেন, "ওঁ আহ হুম।"

বজ্রধরের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে ওরা কলসিগুলো টেনে নিল। ওগুলো সব মদে ভরতি। আর পাত্রগুলোতে রয়েছে মাংস। নারী-পুরুষরা জোড়ায়-জোড়ায় বসে পরস্পরের মুখে মদ-মাংস তুলে দিতে থাকল। তার সঙ্গে চলল মৃদু স্বরে মন্ত্রপাঠ।

মদ-মাংসের পালা শেষ হওয়ার পর, বজ্রধর বাদে বাকিরা বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর আবার একটা মেয়ে বৃত্তের ভিতরে ঢুকতেই বজ্রধর উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আহ্বান করলেন।

বজ্রধর ওই কৌটোগুলোর একটা খুললেন। কালো চুলে জড়ানো, কবজি থেকে কাটা হাতের একটা কঙ্কাল বেরোল। মেয়েটাকে অনাবৃত করে, বজ্রধর টুকরোটা ওর কোমর থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে চুম্বন শুরু করলেন।

একইভাবে বাকি মেয়েদের পালা শেষ হতে, পুরুষরা ঢুকে এল আর তখন মেয়েরাও তাদের কাটা হাতের আবরণে সাজিয়ে দিতে থাকল। তারপর ওরা জোড়ায়-জোড়ায় আটটা কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"ওঁ আহ হুম।" বজ্রধর হুংকার দিয়ে উঠলেন। আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হল। তারপর সম্পূর্ণ নিরাবরণ অবস্থায় বজ্রধর আবার বৃত্তের কেন্দ্রে ওই খুলিটার উপর পা রেখে আগের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। বাকিরা তাঁর দিকে ফিরে হাতজোড় করে বলল, "হে বজ্রধর, হে বুদ্ধোত্তম, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি বুদ্ধের চেয়েও মহান। আপনি আমাদের মহাসুখ দিয়েছেন।"

প্রত্যেকেই একই কথা বলল এবং উত্তরে বজ্রধর বললেন, "শরীরের মধ্যেই মহাসুখ। সেই মহাসুখ তোমার উপলব্ধি হোক!"

এবার তাঁকে ঘিরে নাচ শুরু হল। সেইসঙ্গে সবাই বলতে থাকল, "ওঁ ত্রৈলোক্যক্ষেপ হুম হুম হুম ফট স্বাহা।"

হঠাৎ রিয়া দেখল, সামনেই বজ্রধর দাঁড়িয়ে। রিয়াকে দাঁড় করিয়ে বজ্রধর ওর গা থেকে পোশাকটা খুলে নিলেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখে মুগ্ধতা ফুটে উঠল। বজ্রধর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দমন করলেন। তিনি মনের মধ্যে অনন্ত শূন্যের বোধ জাগিয়ে এই নারীকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন। তাঁর মধ্যে তখন কোনও আবেগ থাকবে না।

রিয়া দাঁড়াতে পারছিল না। ওর দু'চোখে রাজ্যের ঘুম ভর করেছে। বজ্রধর ওকে আবার সিংহাসনে বসালেন। তারপর পাশের বাটি থেকে লাল রং আঙুলে তুলে, ওর বুকে দুটো ত্রিভুজ আঁকলেন। একটা সোজা, একটা উলটো।

আঁকা শেষ হলে একটু পিছিয়ে এসে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বজ্রধর। তিনি বহুদিনের কঠিন সাধনায় বজ্রধর হয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বজ্রধর হয়ে অবস্থান করাটা তার চেয়েও কঠিন। ত্রিভুজ আঁকার সময়ে তিনি নির্লিপ্ত থাকতে পারেননি। স্থির হয়ে তিনি আবার এগোলেন।

সাধারণভাবে এই স্বয়ম্ভূচক্রের জন্য বজ্রকুল থেকেই নারী সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ যাদের কুলদেবতা হেরুক। নেহাত না পাওয়া গেলে, অন্য যে-কোনও নারীকে গ্রহণ করার বিধান আছে। সাধনার উপযুক্ত শক্তিকে আবার বলপ্রয়োগ করে আনতে হয়। স্বয়মাগতা নারী যতটা শক্তি সঞ্চার করতে পারে, তার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তি দিতে পারে বলপূর্বক সংগৃহীত নারী। বজ্রধরের মনে হল, একে আনা দরকার ছিল, ওর কাছ থেকে জিনিসটা কোথায় আছে জানতে হবে।

"ওঁ হেরুক স্বভাবাত্মাকো হম," অর্থাৎ আমিই স্বয়ং হেরুক, বলতে-বলতে তিনি রিয়াকে স্পর্শ করলেন। আবার তাঁর মনটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। স্বভাবক্রোধী হেরুকের রোষ নেমে এলেই বিপদ। তিনি মনকে শাসন করলেন। তিনি আসক্ত হয়ে পড়ছেন। রিয়াকে স্পর্শের সময় তাঁর হাত কেঁপে

উঠেছিল। এতবার চক্রে বসেছেন তিনি, কিন্তু এরকম অনুভূতি কখনও হয়নি।

নির্লিপ্ত থাকার জন্য অন্যদিকে মনটা রাখার চেষ্টা করছিলেন বজ্রধর। নিচু হয়ে বসে নিজের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ভাল করে লাক্ষাগুঁড়ো মাখালেন। মাখানোর সময় বলতে থাকলেন "ওঁ নাগ্রা নাগ্রা।"

একশো আট বার বলা শেষ করে, পাশের পাত্র থেকে তিলের তেল নিয়ে সেই সিঁদুর মুছে দিলেন। এরপর রিয়াকে মাটিতে নামিয়ে, নিজে সিংহাসনে বসে, ওর কোলে পা তুলে দিয়ে বললেন, "কুত্র?"

রিয়ার কানে এসবের কিছুই ঢুকল না। তিনি পা-টা তুলে এনে আস্তে-আস্তে ওর গায়ে বুলিয়ে বললেন, "কুত্র?"

বজ্রধর বুঝতে পারলেন একটা বিপদ আসন্ন। তাই আজ তিনি স্বয়ম্ভূচক্রে ঠিক মতো বসতে পারছেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে সিংহাসনের নীচ থেকে একটা অঙ্কুশ বের করে এনে সেটা দিয়ে নিজের বুকে জোরে আঘাত করলেন। তিনবার আঘাত করার পর মন খানিকটা শান্ত হল।

তিনি রিয়াকে দাঁড় করিয়ে ওর দুই কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "কুত্র? কুত্র? কুত্র?"

বারবার ওই একঘেয়ে গলায় 'কুত্র কুত্র' শুনতে-শুনতে রিয়ার মনে হল, ও যেন একটা কালো অন্ধকার গর্তে ঢুকে যাচ্ছে, ওর দম আটকে আসছে। তারপর বুঝতে পারল ওটা গর্ত নয়, গৌরীকান্ত রায়ের কালো তোরঙ্গে যেন ওকে কেউ বন্ধ করে দিচ্ছে। রিয়া ছটফট করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে-করতে বিড়বিড় করে কী বলতে থাকল। বজ্রধর ওর ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এসে শুনলেন রিয়া বলছে, "গৌরীকান্ত রায়ের কালো বাক্স।"

কথাটা তিনবার শোনার পর, বজ্রধর রিয়াকে আলতো করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তারপর নিজে হেরুককে স্মরণ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। দেবতা তাঁকে সন্ধান দিয়ে দিয়েছেন।

তিনি হেরুকের কাছে কৃতজ্ঞ। যে জিনিসের সন্ধান পাওয়ার জন্য হেরুকপা গোষ্ঠী হন্যে হয়ে ঘুরছে, তার খোঁজ শেষ অবধি পাওয়া গেল। 'হেবজ্রতন্ত্রে' স্বয়ং হেরুক নিজের মুখে লুপ্ত জিনিস পুনরুদ্ধারের

এই মন্ত্র বলে দিয়েছেন। তা কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে? গৌরীকান্ত রায়ের কালো বাক্স।

আদিতে যখন হেরুক আর বজ্রবারাহী লীলা করেছিলেন, তখন তাঁদের কর্পূর আর রক্ত এক হয়ে অমৃতবিন্দু সৃষ্টি করেছিল। সেই অমৃত অক্ষয়, অব্যয়। তার থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পরও সেই অমৃত থেকে গিয়েছে। উড্ডীয়ানে সপ্তাক্ষর হেরুকের মন্দিরে হেরুক আর বজ্রবারাহী শবের উপরে মৈথুনরত অবস্থায় আছেন। বজ্রবারাহীর বাঁ হাতের কপালপাত্রে সেই অমৃত আজও সুরক্ষিত আছে। যেহেতু সেই অমৃত দুর্লভ, তাই হেরুক খোদ উড্ডীয়ানকেই লুকিয়ে রেখেছেন। সমস্ত সাধনাই নির্বাণলাভের জন্য। উড্ডীয়ানের খোঁজ পেলে আর সাধনার দরকার হবে না। ওই অমৃতবিন্দু গ্রহণ করলেই নির্বাণলাভ সম্ভব।

বাকি সাধকরা যা পারেননি, বজ্রধর পেরেছেন। তাঁর বহুজন্মের সুকৃতি যে, হেরুক আজ তাঁকে সন্ধান দিয়েছেন। গৌরীকান্ত রায়ের কালো বাক্স! কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখে জল এসে গেল। তিনি মাথা নিচু করে হেরুকের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তারপর তিনি ধীর পায়ে মণ্ডলের মধ্যে ঢুকে, ঠিক মাঝখানে শুয়ে পড়লেন। তখন ওই আট যুবতী এক-এক করে বলতে থাকল, "হে দেবতা হেরুক, আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করো।"

আটজন বলার পরে তিনি উঠে গর্জন করে বললেন, "হুং!"

সেই নাদে সারা ঘর কেঁপে উঠল।

তিনি আবার বললেন, "হুং!"

তিনবার বলার পর তিনি তাকালেন মণ্ডলের বাইরে মাটিতে শুয়ে থাকা রিয়ার দিকে। সিংহবিক্রমে এগিয়ে এসে, তিনি রিয়াকে দু'হাতে কোলে তুলে মণ্ডলে ঢুকে এলেন। বজ্রধরের সারামুখে গাঢ় নীল রং আর শ্মশানের ভস্ম লেপে রয়েছে, দু'চোখ লাল হয়ে রয়েছে। সেই রূপের দিকে তাকিয়ে বাকিরা হাতজোড় করে প্রণাম করল।

আচমকা ঘরের মধ্যে অনেকগুলো টর্চ জ্বলে উঠল। বজ্রধর চমকে তাকিয়ে দেখলেন পুলিশ। কিছু বোঝার আগেই ডঙ্গেলের দুই লাথিতে তিনি গড়িয়ে গেলেন।

মিত্রা ছুটে গিয়ে রিয়াকে জড়িয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে দিল।

রিয়া একদম বেহুঁশ। পূষণ সিংহাসনের পাশ থেকে নাইটিটা বাড়িয়ে দিতে, মিত্রা রিয়াকে ঢেকে দিল।

একদল পুলিশ ততক্ষণে বজ্রধরকে লাথি মারতে-মারতে বাইরে নিয়ে গিয়েছে। পূষণ স্তম্ভিত হয়ে দেখল, ডোম্বি কোনওরকমে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করছে। তার পাশে সেই লামা ছেলেটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পূষণ ওকে সপাটে একটা চড় মারল। ছেলেটা হাত তুলে প্রতিরোধ করার আগেই, দ্বিতীয় চড়টা মারল।

''ইটস ওকে, ইটস ওকে। কুল ইট!'' বলে ডঙ্গেল পূষণকে সরিয়ে নিল।

মিত্রা আর পূষণ ধরাধরি করে রিয়াকে বের করে আনল। পুলিশ ততক্ষণে বাকি সকলকে টেনে বের করে, যাবতীয় উপকরণ উলটে দিচ্ছে, তছনছ করছে।

নীল রঙের ওপরে ছাইমাখা, গলায়, মাথায়, হাতে হাড়ের মালা পরা বজ্রধরের মুখে টর্চ ফেলে রাজীববাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, ''সঞ্জয়দা আপনি!''

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

ইনস্টিটিউট থেকে বেরোতে সাতটা বেজে গেল। বিকেল নাগাদ মাদ্রাজ স্কুল অফ ইকনমিক্স ই-মেলে জানিয়েছে, মিত্রার পেপারটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। সামনের মাসে ছয় থেকে আট তারিখ ওদের কনফারেন্স। পাঁচ তারিখ বিকেলের মধ্যে পৌঁছোতে হবে। মেলটা পাওয়ার পরই ও পেপারটা নিয়ে নতুন করে বসল। কালিম্পং থেকে ফেরার পর এটা নিয়ে আর বসাই হয়নি। অনেক কিছু অ্যাড করতে হবে।

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়েই মিত্রা দেখল আকাশটা লালচে। একটা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে শুকনো পাতাগুলোকে একপাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। মিত্রা তাড়াতাড়ি পা চালাল। ঝড়টা আসার আগেই অটো পেতে হবে। ঝড়টা শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়ল না।

বাড়ি ফিরে মিত্রা দেখল, পূষণ টেবলের সামনে বসে কী কাজ করছে।

"কী করছ? কখন ফিরলে?"

"পাঁচটা নাগাদ।" মাথা নিচু করেই পূষণ বলল, "রাজীবজেঠু একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।"

"কোথায়? কী লিখেছেন?"

"দ্যাখো, টেবলের উপরেই আছে," মিত্রার দিকে তাকিয়ে পূষণ বলল, "আমরা যেদিন রিয়াকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, সেদিন নাকি হতভাগারা দিয়ার পিছনেও লেগেছিল, জানো?"

"শুনেছি। ওই সময়টা তো হেকটিক গিয়েছে। ফেরার সময় ট্রেনে মা বলেছিল।" মিত্রা উত্তর দিল, "দিয়া যে ঘরটায় থাকত, তার নীচে

নাকি বসে কী সব করছিল, তারপর সন্ধেবেলা বাগানে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে... সে এক বিশ্রী ব্যাপার!”

“রাজীবজেঠু অবশ্য এত কিছু জানেন না। উনি ডঙ্গেলের কাছ থেকে জেনেছেন। স্যাঞ্জে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের আড়ং ধোলাই দিয়ে সব খবর বের করা হয়েছে। এনিওয়ে, তারপর কী হয়েছিল?”

“দিয়ার ঘরের নীচে নাকি বেড়ালের মাথা পুঁতে রেখেছিল! তারপরে রাতে কোন ফাঁকে ঘরের মধ্যে বেড়ালছানা ঢুকে পড়েছিল, তাই দেখে সকলেই খুব ভয় পেয়েছিল। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। একে রিয়াকে নিয়ে টেনশন, তারপর বাড়ির মধ্যে ওই ব্যাপার। আমরা রিয়াকে নিয়ে না ফিরলে, সারারাত কী করত কে জানে!”

“রিয়ার পর দিয়া আর সিলেরি গাঁওতে তুমি। তোমাদের তিন বোনকেই টার্গেট করেছিল।” পূষণ আবার নিজের কাজে ঝুঁকে পড়ল।

মিত্রা ইতিমধ্যে আরাম করে বসে চিঠিটা টেনে নিয়েছে। রাজীববাবু বেশ বড় একখানা চিঠি লিখেছেন। তাতে বলেছেন, সেই রাতে স্যাঞ্জের সঙ্গে আরও যারা ধরা পড়েছিল, তাদের জেরা করে, বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ বেশ কিছু লোককে তুলে এনেছে। ডঙ্গেল সেই শিবমন্দিরেও হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনের কোনও লোকজন ওখানে ছিল না। যাদের পুলিশ তুলে এনেছে, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা গিয়েছে।

ওরা প্রত্যেকেই হেরুকপা গোষ্ঠীর সদস্য। তিব্বত, নেপাল আর সিকিমের কিছু কিছু রিমোট এরিয়ায় ওরা ছড়িয়ে আছে। ওরা একটু আড়ালেই থাকে। ওরা বিশ্বাস করে, সেই উড্ডীয়ান নামের জায়গাটা কোথাও লুকোনো আছে এবং দু’-একজন ছাড়া তার খোঁজ কেউ জানে না। সেই সৌভাগ্যবান দু’-একজন যে কারা, সেটাও ওরা জানে না। ফলে ওরা একরকম মেনে নিয়েছে যে, উড্ডীয়ানের সন্ধান আর পাওয়া যাবে না।

জিম্মে দোরজি এবং তার ছেলে স্যাঞ্জে এই গোষ্ঠীর সদস্য। কালিম্পং-এ বাড়ি কেনার পর, কোনওভাবে গৌরীকান্ত রায় হেরুকপা গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়েন। আসলে ওঁর রক্তে তন্ত্রের প্রতি একটা টান ছিল। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে-করতে কখনও হয়তো উনি

জানিয়েছিলেন যে, কোনও তান্ত্রিক ওঁর পূর্বপুরুষদের কিছু দিয়েছিলেন। এমনটাও বলতে পারেন যে, সেই তান্ত্রিক উড্ডীয়ানের লোক ছিলেন।

মোটমাট সেই কথা শুনেই হেরুকপারা ধরে নেয় যে গৌরীকান্ত রায়ের কাছে উড্ডীয়ানের হদিশ আছে এবং উনি নাকি সেই মন্দিরটা খোঁজার চেষ্টা করছেন। ফলে হেরুকপারা ওঁর পিছনে লাগে। কিন্তু কিছুতেই তার হদিশ করতে না পেরে গৌরীকান্তকে খুন করে। হয়তো ভেবেছিল, ওঁর সঙ্গেই জিনিসটা আছে। কিন্তু সেটাই ভুল হয়েছিল। কারণ যেটুকু হদিশ পাওয়ার আশা ছিল, গৌরীকান্তের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা একদম হারিয়ে গেল।

যদিও হেরুকপারা আশা ছাড়েনি। তারা ইন্দুশেখর রায়ের পিছনেও লেগেছিল। কিন্তু তিনি এসবের কোনও খবর রাখতেন না এবং কালেভেদ্রে কালিম্পং আসতেন।

এমন সময় জিম্মে ইন্দুশেখরের কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া নেয়। হেরুকপা হওয়ার দরুন জিম্মে এবং ছেলে স্যাঞ্জে সমস্ত ঘটনাই জানত। কোনওভাবে উড্ডীয়ানের খোঁজ পাওয়ার জন্যই জিম্মে ওই বাড়ি ভাড়া নেয়। কিন্তু সে উড্ডীয়ানের খোঁজ পায়নি।

হেরুকপারা নিজেদের গোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটা নিয়ম মেনে চলে। তার মধ্যে একটা হল, একজন সদস্য কখনও অন্য সদস্যের সম্পত্তির প্রতি লোভ করবে না, অন্যের পরিবারের নারীর প্রতি নজর দেবে না। সম্ভবত সেজন্যই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিম্মে বাড়িটা দখল করেনি। না হলে তো ওটা এত দিনে জবরদখল হয়ে যাওয়ার কথা।

জিম্মে মারা যাওয়ার পর ওর ছেলে স্যাঞ্জে বাড়ির ভাড়াটে হয়। এদিকে মৃগাঙ্কশেখররাও প্রায়ই এখানে যাতায়াত শুরু করেন। ফলে স্যাঞ্জের সঙ্গে বাড়ির মালিকদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। সেই সময় কোনওভাবে স্যাঞ্জের হাতে গৌরীকান্তের শেষ কয়েক বছরের ডায়েরি এসে পড়ল। রাজনীতির সুবাদে ও বহুদিন কলকাতায় ছিল, কাজেই বাংলা লেখা পড়তে ওর অসুবিধে হল না। অথবা চেনা কাউকে দিয়ে পড়িয়েছিল, তাও হতে পারে।

ডায়েরি পড়ে স্যাঞ্জের দৃঢ় ধারণা হল যে, গৌরীকান্ত রায় সত্যি-সত্যিই উড্ডীয়ানের হদিশ জানতেন। ওই তান্ত্রিক তাঁর পূর্বপুরুষদের

এমন কিছু দিয়েছিলেন, যার মধ্যে উড্ডীয়ানে যাওয়ার হদিশ ছিল। ও তখনই নতুন করে জিনিসটাকে খুঁজে বের করার পরিকল্পনা করল। স্যাঞ্জে দোরজির সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল দুর্দান্ত। বয়সকালে প্রায় একার হাতে এখানে পার্টিটা দাঁড় করিয়েছিল। রাজনীতি করলেও তলে-তলে তন্ত্রের চর্চাও চালিয়ে যাচ্ছিল সে। নিজের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ও হেরুকপাদের এক জায়গায় জড়ো করে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলল যে, উড্ডীয়ানের খোঁজ পাওয়া যাবে।

যারা ওর ডাক শুনে এগিয়ে এল, তাদের কাছে স্যাঞ্জে বজ্রধর হয়ে দাঁড়াল। হেরুকপাদের কাছে বজ্রধর মানে স্বয়ং ভগবান হেরুক, যিনি দয়া করে ওদের নির্বাণের পথ দেখাতে এসেছেন। ও সামনে আসত না, আড়াল থেকে নির্দেশ পাঠাত। ওর পরিচয় জানত বজ্রধৃক মানে ওই লামা ছেলেটা আর ডোম্বি।

বজ্রধৃক বা ডোম্বি কোনওটাই আসল নাম নয়। বজ্রধরের প্রধান শিষ্যকে বলা হয় বজ্রধৃক আর হেরুকের নিজস্ব পরিমণ্ডলে যে আটজন দেবী আছেন, সেই আটজনের মধ্যে একজন হলেন ডোম্বি। মেয়েটার আসল নাম রুকমা। একমাত্র বিশেষ চক্রে যখন স্যাঞ্জে হাজির হত, তখন তার বেশভূষা, বোলচালের জন্য বাকিরা তাকে দেবতা হিসেবেই দেখত।

গৌরীকান্ত রায়ের পর থেকে আশি বছরের উপরে কেটে গিয়েছে। কালিম্পং শহরও আগের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। হেরুকপা গোষ্ঠী এবার নতুন গুরুর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠল। আশপাশে যে সমস্ত মনাস্ট্রি দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে এরা ব্যবহার করতে শুরু করল। একটা সময় তো এসব মঠ-মন্দির সত্যিই ওদের সাধনার জন্য ব্যবহার করা হত। গৌরীকান্ত রায়ের ডায়েরিতেও তার প্রমাণ আছে। পুরো ব্যাপারটাই একটা গোপনীয়তার মোড়কে ঢেকে রাখা হত। বাইরে থেকে দেখে কেউই বুঝত না, তলে-তলে এখানে কী চলে!

হেরুকপাদের কাছে উড্ডীয়ান মানে সাংঘাতিক ব্যাপার! যে উড্ডীয়ানের খোঁজ আজ পর্যন্ত দু'-একজন ছাড়া জানত না, তার খবর যদি হঠাৎ করে সামনে এসে পড়ে, তা হলে এরা নেচে উঠবেই।

স্যাঞ্জে কয়েকজন চেলাকে পাঠিয়ে দিল কলকাতায় ওদের বাড়িতে

নজর রাখার জন্য। কিন্তু বাইরে ঘুরঘুর করলে তো আর ভিতরের খবর জানা যায় না। বিশেষত কলকাতায় ওদের কোনও ক্ষমতাই নেই। কাজেই সেদিকে কোনও লাভ হল না।

কালিম্পং-এর বাড়িতে নানারকম অদ্ভুত ঘটনার কথা বলে স্যাঞ্জে মৃগাঙ্কদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল, যাতে ওঁরা বাড়িটা ওর হাতে ছেড়ে দেন। স্যাঞ্জে যে পরিবেশে মানুষ এবং যে গোষ্ঠীর সদস্য তাতে লোকজনকে ভয় দেখানোটাই ওর কাছে স্বাভাবিক। ওর ধারণা ছিল, মৃগাঙ্করা ভয় পেয়ে ওদের কাছেই বাড়ি বেচে দেবেন। কিন্তু মৃগাঙ্ক যে বেঁকে বসবেন এবং কালিম্পং-এ হাজির হবেন, ও ভাবেনি।

মৃগাঙ্কদের ভয় দেখানোর জন্য স্যাঞ্জের লোকজন সব সময়ই আনাচেকানাচে ওত পেতে থাকত। তার মধ্যে অভিচার ক্রিয়া, মন্ত্রের ক্রিয়া সবই ছিল। মৃগাঙ্করা কালিম্পং-এ হাজির হওয়ায় একটা সুবিধে হল। গল্পের ফাঁকে স্যাঞ্জে অনেকগুলো জিনিস জানতে পারল। প্রথমত, জিনিসটার খোঁজ এরা কেউ জানে না। দ্বিতীয়ত, গৌরীকান্তের একটা আলাদা পুজোর ঘর ছিল এবং ওখানে কোনও গুপ্ত ঘর থাকার সম্ভাবনা আছে।

ও তখন মতলব আঁটল যে, মন্ত্রের ক্রিয়া করবে। সেটা করতে গেলে, গৌরীকান্ত রায়ের রক্ত আছে এমন কাউকে নিয়ে বসতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ওরা রিয়াকে পেয়ে গেল। রিয়া কোনও কারণে মাঝরাতে বা ভোরে বাইরে বেরিয়েছিল। স্যাঞ্জের চ্যালারা সব সময়ই ওই বাগানে থাকত ওদের ভয় দেখানোর জন্য। তারা রিয়াকে তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু রিয়া কেন চিৎকার করেনি, সেটাই আশ্চর্যের। হয়তো রিয়া একদম ঘুমের ঘোরেই বাইরে বেরিয়েছিল। ওর তো স্লিপ ওয়াকিং-এর একটা সমস্যা ছিলই।

গোড়ায় স্যাঞ্জে ঠিক করেছিল, রিয়াকে নিয়ে মন্ত্রের ক্রিয়াটা করে হদিশ জেনে নেবে। কিন্তু ও যখন দেখল রিয়ার পিরিয়ড চলছে, তখন ওর মাথায় অন্য মতলব জাগল। হেরুকপাদের কাছে রজস্বলা নারীর গুরুত্ব সাংঘাতিক। কুমারী বা সধবা হলে তো কথাই নেই, এমনকী বিধবাও যদি রজস্বলা হয়, তা হলে তাকে নিয়েও চক্রে বসা যায়। অবশ্য প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদা চক্র।

স্যাঞ্জে রিয়াকে নিয়ে সেই চক্রে বসল। হেরুকপাদের নিয়মটা এখানে কাজে লাগল না। কারণ রিয়া ওর মায়ের দিক থেকে গৌরীকান্ত রায়ের সঙ্গে রিলেটেড। ও হেরুকপা গোষ্ঠীর কারও কন্যা নয়। চক্রে রিয়ার মুখ থেকে গৌরীকান্ত রায়ের কালো বাক্সের কথা জানা গেল। স্যাঞ্জে নিশ্চিত হল, ওই বাক্সগুলো ঘাঁটতে পারলেই উড্ডীয়ানের হদিশ পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত সেটা আর স্যাঞ্জের কাজে লাগল না।

এটা শোনার পর রাজীববাবু সমস্ত তোরঙ্গ ঘেঁটেছেন, কিন্তু কিছুই পাননি। স্যাঞ্জের ঘর থেকে গৌরীকান্তের শেষ ডায়েরিটাও পাওয়া গিয়েছে। রাজীববাবু ওটার একটা ফোটোকপি করে, ওরিজিনালটা পূষণকে কুরিয়ার করে দেবেন।

রাজীববাবুর চিঠির মূল বক্তব্য এটাই। উনি পূষণকে বেশ কিছু বই রেফার করেছেন। তারপরে জানতে চেয়েছেন, পূষণ ওই *কমলে কুলিশ হেরি ভাতিল শ্রীমুখ/ বিবাদী বা বাদী ছাড়া ব্রাহ্মী বিমুখ। আখরে আদরে জাগে অজা বোধীসুখ* লাইনগুলোর কোনও মানে বের করতে পেরেছে কি না। *ঠগ হলে ঠগ হবে* লাইনটার মানেই বা কী? প্রথম ঠগের নীচে হলুদ আন্ডারলাইনই বা কেন? পূষণ কিছু পেলে যেন ওঁকে জানায়।

চিঠিটা পড়ে মিত্রা বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ওই ঠগিকাহিনি নিয়ে পড়েছ?"

"ইয়েস ম্যাডাম।"

" তা স্লিম্যান সাহেব কতদূর এগোলেন? ঠগি নিধন হল?"

"নাহ্। বিবাদী বা বাদী ছাড়া ব্রাহ্মী বিমুখ!"

মিত্রা আর কোনও কথা বলল না। নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ল্যাপটপ খুলে বসল। পূষণ বলল, "তোমার প্রপিতামহ যে কী লিখেছেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।"

কোনও উত্তর না পেয়ে পূষণ মুখ তুলে দেখল, মিত্রা একমনে পড়ছে। পূষণ আর কথা বাড়াল না। ওর সামনে এখন একগাদা লাইন

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো।
লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে।
আছো অন্তরে চিরদিন তবু কেন কাঁদি?
তোমার পূজার ছলে
তোমায় ভুলেই থাকি।
জীবনে যত পূজা হল না সারা।
ঘরে তখন রাখবে কে আর ধরে
আমার ঘরে তোমায় আমি একা রেখে দিলাম স্বামী
আমার এ ঘর বহু যতন করে ধুতে হবে, মুছতে হবে মোরে।
তোমায় দিতে পূজার থালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি।

কাজ করতে-করতে দু'জনেরই হুঁশ ফিরল রাত সাড়ে দশটায়। পূষণের মা খেতে ডাকছেন।

খাওয়ার টেবলে বসে পূষণের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, রিয়া কেমন আছে? ফোন করেছিস?"

"বেটার, তবে ট্রমাটা এখনও কাটেনি।" মিত্রা বলল।

"সে তো হবেই। যা গেল ওর উপর দিয়ে," পূষণের মা বললেন, "মেয়েটা যে স্বাভাবিক আছে এই অনেক।"

আরও কিছুক্ষণ টুকটাক কথা চলল, রিয়াকে নিয়ে আলোচনা হল। রাজীববাবুকে নিয়েও আলোচনা হল। সেখান থেকে আলোচনা গড়াল কালিম্পং, তন্ত্রচর্চার দিকে। আলোচনায় সকলে এতটাই মশগুল হয়ে গিয়েছিল যে, টেবল ছেড়ে উঠতে রাত পৌনে বারোটা বাজল।

॥ ২ ॥

কাঁকুড়গাছির বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মিত্রার মনে হল, রবিবারটা যেন আরও ঝলমল করে উঠছে। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ল, পাশের মাঠে অনি ক্রিকেট খেলছে। মিত্রাকে দেখে একগাল হেসে হাত তুলল। মিত্রাও হাত নাড়ল।

সুনন্দা জানতেন না যে মিত্রা আসবে। হঠাৎ মেয়েকে দেখে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "আয় বোস, পূষণ আসেনি?"

" না, ও শান্তিনিকেতন গিয়েছে একটা কাজে।

"কবে ফিরবে?"

"বলে তো গিয়েছে পরশু ফিরবে। দ্যাখো কবে ফেরে। ওর তো কোনও ঠিক নেই!"

মায়ের সঙ্গে টুকটাক দু'-চারটে কথা বলেই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল মিত্রা। সুনন্দা বললেন, "রিয়াকে তোর ঘরে শিফ্‌ট করানো হয়েছে।"

রিয়া নার্সিংহোম থেকে সোজা মামার বাড়িতে এসে উঠেছে। ধারের ঘরটা ওর জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ মিত্রার ঘরে আনতে হল কেন?

সুনন্দার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, "আবার উৎপাত শুরু হয়েছে!"

"উৎপাত? কী হয়েছে?"

"তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস!"

"কী হয়েছে বলবে তো!" মিত্রা বিরক্ত হয়েছে।

সুনন্দা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "রিয়া ভয় পায়। ফুটপাথের ওই শিরীষ গাছটা দেখে ও ভয় পায়।"

"কেন?"

"জানি না! কারা নাকি ওর ডালে বসে থাকে আর ওকে ডাকে!"

"হোয়াট?"

"তাই তো বলল!"

"কী বলল? ঠিক করে বলো তো?"

সুনন্দা বললেন, রিয়া নাকি ক'দিন রাতে ঘুমের মধ্যেই একটা কান্নার শব্দ পাচ্ছিল। প্রথমে কেউ সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু দিন চারেক আগে রিয়া নাকি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছে, তিন-চারটে লোক গাছে উঠে ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই থেকে ওর ভয় শুরু হয়েছে। ঘটনাটা ও কিঙ্করকে আর অনিকে বলেছিল। ওরা দু'জনেই নজর রেখেছিল। কাউকে দেখতে পায়নি। পরশু রাতে রিয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল। বারবার গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছিল, "ওরা ওখানে বসে আছে! আমাকে ডাকছে!"

এই দেখে বাড়ির সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারপর আজ সকালেই মৃগাঙ্কর নামে পোস্টে একটা এনভেলপ এসেছে। তিনি খুলে

দেখেন, খামের মধ্যে একটা ছোট চৌকো প্লাইউডের টুকরো। মৃগাঙ্ক প্রথমটায় খুব রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুপুর থেকে কীরকম গুম মেরে আছেন!

মিত্রা খামটা দেখতে চাইল। কাঠের টুকরোটার উপর লাল আর সাদা দিয়ে একটা ষড়কোণ আঁকা। রাজীবজেঠু এটাকেই যবযুম যন্ত্র বলেছিলেন না!

সুনন্দা গজগজ করছেন, "বাড়ি বেচেও শান্তি নেই। এখনও উৎপাত চলছে।"

মিত্রা সেসব কিছুই শুনল না। ওর মাথায় ঘুরছে এই কাঠের টুকরোটা। কে পাঠাল? যারা পাঠাতে পারত, তারা তো জেলে। তা হলে? তার মানে কালিম্পং-এর বাড়ি বেচার পর সব চুকে যায়নি। রাজীবজেঠু বলেছিলেন, হেরুকপা গোষ্ঠীর লোকজন এদিকে-সেদিকে লুকিয়ে আছে। উড্ডীয়ানের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। সেরকম কিছু কি?

রিয়া জানলার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে ছিল। এখনও সারা শরীরে ব্যথা। বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে না। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। মামা-মামিরা আদরে ভরিয়ে রেখেছে। তবু রিয়ার মনে হয়, বেঁচে থেকে কী লাভ। যার জন্য বসে ছিল, এখন তাকে আর কিছুই বলার নেই। কাকে ঠোকরানো ফল কি আর কেউ নিতে চায়?

পৃথিবীতে সব কিছু নিজের নিয়মেই চলছে। কালিম্পং-এর বাড়িটা ঠিকই বিক্রি হয়ে যাবে। রাজীবজেঠুকেই সব দায়িত্ব দিয়ে আসা হয়েছে। বাড়িটা কিনছে পার্টির লোকেরাই, কাজেই কোথাও কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ওই শয়তানটা আর তার বাকি সাঙ্গোপাঙ্গরা এখনও জামিন পায়নি। পার্টি থেকেও নাকি ওকে বের করে দিয়েছে। এই নিয়ে কয়েকদিন বেশ নড়াচড়া হলেও, পৃথিবী আবার নিজের নিয়মে ফিরে গিয়েছে। মাঝখান থেকে ওর শরীরটাই নোংরা হয়ে গেল। নিজেরই ঘেন্না করে। এই শরীরটা যদি আগুনে পুড়িয়ে নতুন শরীর নিয়ে বাঁচা যেত, তা হলে ও বাঁচতে চাইত। রিয়া একবার বিছানার পাশে তাকাল। একগাদা বই ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কোনওটাই পড়তে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে তাকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

মিত্রা ঘরে এসে ঢুকল, "কী রে? শরীর কেমন?"

রিয়া ক্লিষ্ট হাসল, "আয় মিত্রাদি, বোস।"

"কী করছিস? বাকিরা কোথায়?"

"দিয়া পড়তে গিয়েছে আর কিঙ্কর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে।"

"দিব্যি আছে ব্যাটা। আবার ঘুরতে গিয়েছে?" মিত্রা হাসল।

রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সকলেই ভাল আছে। বহু চেষ্টা করেও জিজ্ঞেস করতে পারল না পূষণদা এসেছে কি না!

মিত্রা তাকাল বোনের দিকে। ডঙ্গেল না থাকলে রিয়ার মতো অবস্থা মিত্রারও হতে পারত। শিবমন্দিরটায় যখন লোকগুলো ওদের ঘিরে ফেলেছিল, তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল মিত্রা। নেহাত রিয়াকে খোঁজার টেনশনে ঘটনাটার এফেক্ট ও তখন টের পায়নি। কিন্তু এতদিন পরও ওই মুহূর্তটা মনে পড়লে গা হিম হয়ে আসে। ও নানা প্রসঙ্গ টেনে এনে রিয়াকে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মৃগাঙ্ক ঘরে ঢুকলেন।

"কখন এলি?"

"এই তো!"

"পূষণ আসেনি?"

"শান্তিনিকেতন গিয়েছে। পরশু ফেরার কথা।"

রিয়া চোখ বন্ধ করল। এতক্ষণ ভাবছিল পূষণ বোধহয় নীচে আছে! কথাটা আর বলা হবে না! মৃগাঙ্ক আবার বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মিত্রা আবার গল্প শুরু করলেও বুঝতে পারছিল যে, রিয়া অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বকবক করার পর শুনতে পেল বাবা ডাকছেন।

মৃগাঙ্ক কীরকম চুপ করে রয়েছেন। রিয়াকে নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ডাক্তার বলেছেন যে, শারীরিক আঘাতের চেয়েও মেন্টাল ট্রমাটাই সাংঘাতিক এফেক্ট করেছে। ওকে সব সময় হাসিখুশি রাখতে হবে। মনের জোর ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় এই ট্রমাটা কাটবে না। কোনও কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। কোনও ব্যাপারে জোর করা চলবে না। যতক্ষণ না এই ট্রমা কাটছে ততক্ষণ এরকমই চলবে। এসব কথা বলতে-বলতে মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন, "রিসেন্ট ঘটনা শুনেছিস?"

মিত্রা ঘাড় নাড়ল। মৃগাঙ্ক এমন একটা কথা বললেন, যে রবিবারের সমস্ত ঝলমলানি উবে গিয়ে চারদিক কেমন বিষণ্ণ আর গুমোট হয়ে উঠল।

রাজীববাবু ফোনে জানিয়েছেন যে, স্যাঞ্জে দোরজি জামিন পেয়ে গিয়েছে। কোনও অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়নি। রিয়াকে যে ও ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। কোর্টে দাঁড়িয়ে ওর উকিল বলেছে যে, রিয়া স্বেচ্ছায় ওদের সাধনাচক্রে যোগ দিতে এসেছিল। রিয়ার গায়ে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। রেপ চার্জ সেই জন্য দাঁড়াবে না বলেই মনে হচ্ছে। তা ছাড়া যখন কেস উঠবে, তখন তো রিয়ার পক্ষে ওখানে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া সম্ভব নয়। গেলেও ও কাউকেই শনাক্ত করতে পারবে না।

মৃগাঙ্কর এখন চিন্তা হচ্ছে যে, স্যাঞ্জে হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। কথাটা যে মিত্রারও মনে হচ্ছে না, তা নয়। সবচেয়ে আগে তো প্রতিশোধ নেবে রাজীববাবুর উপরে!

মৃগাঙ্ক মিত্রাকে ওই কাঠের টুকরোটার কথা বললেন। মিত্রা অন্যমনস্কভাবে দু'-চারটে কথা বলল। এখন কী করা যায়? স্যাঞ্জে দোরজি জামিন পেয়েছে। তারপর বাড়িতে ওই যবযুম চিহ্নটা এসেছে। তার মানে আবার উৎপাত শুরু হবে! রিয়া কি সত্যি কাউকে দেখেছে? না হলে হঠাৎ ভয় পাচ্ছে কেন?

বিকেল চারটে নাগাদ মিত্রা বেরিয়ে এল। ভাল লাগছে না। অন্যমনস্কভাবে অটোস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। অটো নিয়ে শোভাবাজারে নেমে মেট্রো ধরবে। ও এতটাই অন্যমনস্ক ছিল যে, একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে ওর পিছন-পিছন হাঁটছে খেয়ালই করেনি।

শোভাবাজার থেকে মেট্রো ধরল মিত্রা। লোকটাও ওর পিছন-পিছন মেট্রোয় উঠে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দু'বার মিত্রার গায়ে পড়ল। কিছুটা হয়তো ইচ্ছাকৃত ছিল। মিত্রা ওকে একবার দেখল। আবার ডুবে গেল নিজের চিন্তায়। সব মিটে যাওয়ার পরও ওরা পিছনে লেগেছে কেন? তা হলে কি ওই হরি-বাহনোদ্ভবের মূর্তিটা? কালিম্পং থেকে ফেরার সময় রাজীববাবু মূর্তিটা ওদের

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পোনিয়্যাতে রিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য ওটার কথা খেয়াল হয়নি। সে যাই হোক, মূর্তিটাই কি ওদের টার্গেট? না কি অন্য কিছু আছে?

রবীন্দ্রসরোবরে নেমে একটা রিকশা নিল মিত্রা। ওর রিকশাটা চলতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই পিছনের রিকশাটাও প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলতে শুরু করল। যখন কাঠপুলে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে, তখন লোকটাকে আবার চোখে পড়ল ওর। মুখটা চেনা-চেনা লাগলেও সেভাবে খেয়াল করল না। মিত্রা নিজের মতো হাঁটতে থাকল। বুঝতে পারল যে, লোকটাও ওর পিছনে। দ্রুত পায়ে নিজেদের পাড়ায় ঢুকে একটু চলার পর মিত্রা ঘুরে দাঁড়াল। এখন লোকটার মুখোমুখি হতে ওর কোনও ভয় নেই। এটা ওর নিজের পাড়া। সামনেই চিলড্রেন্‌স পার্কের গেটে পূষণের বন্ধুরা আড্ডা মারছে। কিন্তু লোকটা দেখা গেল না। লোকটা কি মিত্রাকে ফলো করছিল না কি পুরোটাই ওর মনের ভুল? আসলে স্যাঞ্জের জামিন পাওয়ার খবর শোনার পর থেকেই মনটা খিঁচড়ে আছে। মনের মধ্যে একরাশ খচখচানি নিয়ে মিত্রা বাড়ি ঢুকল।

॥ ৩ ॥

"জানো, সরস্বতীর আর একটা নাম ব্রাহ্মী!" খাটে বসে পূষণ বলল।

"তাই? কে বলল?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"দিস বুক!" একটা মলাটছেঁড়া বই দেখিয়ে পূষণ বলল। ও সাংঘাতিক উত্তেজিত।

"বইটা হঠাৎই পেয়ে গেলাম," বইটা দেখিয়ে পূষণ আবার বলল, "তুমি কি জানো যে, আমরা যে দিনটায় সরস্বতীপুজো করি, মানে শ্রীপঞ্চমীর দিন, ওই দিন ওরিজিনালি লক্ষ্মীর পুজো হত?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মিত্রা বলল, "শয়তানটা জামিন পেয়েছে!"

"সে কী?" পূষণ অবাক। "কে বলল?"

মিত্রা সব ঘটনা খুলে বলল। স্যাঞ্জে দোরজির জামিন পাওয়া থেকে শুরু করে ওকে একজন ফলো করছিল, সবকিছুই।

শুনতে-শুনতে পূষণ চিন্তিত মুখে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "দেখা যাক। সেরকম কিছু হলে শাক্যকে জানাতে হবে। ও এখন ডিএসপি টাউন।"

মিত্রা বলল, "সে না হয় জানালে। কিন্তু ওই পার্সেলটা কেন পাঠাল? আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

"কী?"

"মূর্তিটা মনে হয় ওদের টার্গেট নয়। অন্য কিছু আছে। যেটার কথা আমরা কেউ জানি না।"

"দেখা যাক। এনিওয়ে তুমি এখন কী করবে?"

"পেপার নিয়ে বসব। সামনের সপ্তাহেই যেতে হবে। এখনও পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানানো হয়নি।"

আরও একটা-দুটো কথা বলে মিত্রা ল্যাপটপ নিয়ে নিজের কাজে ডুবে গেল। একটু চিন্তা করে লিখল, 'দ্য আর্থ সোয়েট্স'। তারপর নীচে ছোট ছোট করে লিখল, 'টু ওরি অর নট টু ওরি, দ্যাট ইজ় দ্য কোয়েশ্চেন' প্রথম স্লাইডটা তৈরি করার পরই ওর মাথায় আর-একটা আইডিয়া এল। একবার রাজীবজেঠুর সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রসঙ্গে কোনও দেবতার রেফারেন্স দেওয়া যায় কি? পূষণ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

কমলে কুলিশ হেরি ভাতিল শ্রীমুখ এই লাইনটা নিয়ে কোনও অসুবিধে নেই। কুলিশ মানে বজ্র। কাজেই এটা সেই পদ্ম আর বজ্রের কনসেপ্ট। কিন্তু *বিবাদী বা বাদী ছাড়া ব্রাহ্মী বিমুখ* মানে কী? কোনও কেসের কথা বলছেন কি? কেস না হলে সরস্বতী বিমুখ হবেন কেন? লক্ষ্মী বিমুখ হতে পারেন! শ্রী মানে অবশ্য লক্ষ্মী। পদ্ম আর বজ্রের সঙ্গেই বা সরস্বতীর কী সম্পর্ক? তারপর *আখরে আদরে জাগে অজা বোধীসুখ,* নাহ্ আরও ভাবতে হবে!

পূষণ আবার পাতা উলটে দেখল। পরপর চারটে পাতা সাদা। অবশ্য পুরো সাদা নয়। প্রথম পাতাটা ছেড়ে দিয়ে বাকিগুলোর মাথার

উপর একটা করে ছোট রঙিন তির আঁকা রয়েছে। প্রথমটা নীল তার পাশের পাতায় লাল আর শেষ পাতায় সবুজ। তারপরই গানগুলো। মাথার উপরে বাঁ দিকে তারিখ রয়েছে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪।

এই রঙিন চাকতিগুলো নিশ্চয়ই ওই চক্রগুলো বোঝাচ্ছে, না হলে বুদ্ধ। পূষণ দ্রুত নিজের ছোট খাতাটা খুলল। নীল মানে ধর্মচক্র, লাল মানে সম্ভোগচক্র আর সবুজ মানে মহাসুখচক্র। রাজীবজেঠুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল পূষণ। ও চটপট বাকি পাতাগুলো দেখে নিল। ওরকম কোনও দাগ নেই। তার মানে কি এক-একটা পাতা এক-একটা চক্র বোঝাচ্ছে। তির মানে কী? ক্রমশ এগিয়ে চলা? চক্র থেকে চক্রে ক্রমশ উঠে যাওয়া? তার মানে ফাইনাল চক্রের সঙ্গে ওই গানগুলোর কোনও সম্পর্ক আছে।

দাঁতে পেন ঠুকতে-ঠুকতে পূষণ আবার ওই বিবাদী-বাদীর পাতায় ফিরে গেল। ওটাও লেখা হয়েছে সেই ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ তারিখেই। পূষণের মাথায় এই বাক্যটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

ডায়েরির ফাঁক থেকে পোস্টকার্ডটা বের করে পূষণ অবাক হয়ে গেল। ওই একই তারিখে ছেলেকে লিখেছেন গৌরাকান্ত। পূষণ চিঠিটা পড়তে শুরু করল। কালিম্পং-এ থাকাকালীন ভাল করে পড়েনি, জাস্ট চোখ বুলিয়েছিল। কিন্তু এখন পড়তে-পড়তে নতুন করে কিছু প্রশ্ন জাগল।

ছেলেকে বাবা মন দিয়ে পড়াশোনা করার কথা বলছেন। বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে নিজের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কী সেই দায়িত্ব? সে যেন কখনও সুরকে অবহেলা না করে। সবসময় মনে রাখে সুর থাকলেই সব থাকবে। এখানে সুর মানে কী? দেবতা মিন করছে? সুর আর অসুর? নাকি গানের সুরের কথাই বলা হচ্ছে?

"অ্যাই শুনছ, এক মিনিট," পূষণ ডাকল।

মিত্রা স্লাইড তৈরিতে এত মশগুল ছিল যে পূষণের কথা প্রথমে শুনতে পেল না। পূষণ দ্বিতীয়বার ডাকতে ও মুখ তুলে তাকাল।

"সুর মানে কী?"

"কী?"

"সুর মানে কী?"

"সুর মানে সুর। আবার কী? সা রে গা মা। হঠাৎ বোর করছ কেন?"

"বোর নয়। তোমার প্রপিতামহ তাঁর ছেলেকে বলছেন যে, বড় ছেলে হিসেবে তার দায়িত্ব কখনও সুরকে অবহেলা না করা।"

"কী?"

পূষণ কোনও কথা না বলে চিঠিটা ওর চোখের সামনে ধরল। মিত্রা চিঠিটা পড়ে খোনা গলায় গেয়ে উঠল, "হবে হবে সব হবে, গান হবে সুর হবে। উনি বোধহয় ভূতের রাজার কথা বলতে চাইছিলেন!"

হাসতে-হাসতে আচমকা মিত্রা থমকে গেল। কিছুক্ষণ পূষণের দিকে তাকিয়ে খুব সিরিয়াস গলায় বলল, "পূষণ, বাদী বিবাদীর আর-একটা মানে হয়। যে-কোনও সুরে সাতটা স্বরের যেটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে বাদী। সেকেন্ড হায়েস্টটা হল বিবাদী। বাদী-বিবাদী বলতে সুরের কথাও বলা থাকতে পারে!"

পূষণ ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে ওই পাতাটায়। পরপর দশটা লাইন লেখা।

"এই সুরগুলোর বাদী-বিবাদী স্বরের কথা বলতে চাইছ?"

''এক মিনিট,'' বলে মিত্রা প্রেজ়েন্টেশন সেভ করে ল্যাপটপটা বন্ধ করে, ঝুঁকে এল পূষণের খাতার দিকে। ডায়েরিটা টেনে নিয়ে এক-একটা লাইন ধরে কিছুক্ষণ সুর ভাঁজল। তারপর বলল, "ধ্যাত হচ্ছে না! অন্য কিছু হবে!"

"মনে হচ্ছে পেয়ে গিয়েছি," পূষণের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, "বাদী মানে যে স্বরটা সবচেয়ে বেশি ইউজ় হয়েছে, তাই তো?"

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ও লাইনগুলোর নীচে দাগ দিচ্ছে। তারপরে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আই গট ইট!"

"ওয়াও! ছকটা কী?"

"কিছুই না। জাস্ট বাদী-বিবাদী," পূষণ বলল, "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, হৃদয় মাঝে লুকিয়ে এসো। লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু। সবচেয়ে বেশি যে শব্দটা রয়েছে সেটা হল 'লুকিয়ে'।"

"আরে হ্যাঁ! তার মানে নেক্সট হল 'আছে'। লুকিয়ে আছে।"

"আমাকে দাও," পূষণ খাতাটা কেড়ে নিল।

"ভাল হবে না বলছি, দাও," বলে মিত্রা আবার টেনে নিয়ে বলল, "পূজা শব্দটা আছে তিনবার, ঘরেও তিনবার। 'তোমায়' রয়েছে দু'বার আর 'তোমার' একবার।"

"তোমায় আর তোমার একই ধরনের।" পূষণের গলাতেও উত্তেজনা, "এবার সাজাও।"

মিত্রা বলল, "লুকিয়ে আছে তোমার পূজার ঘরে। গ্রেট! শেষ পর্যন্ত গৌরীকান্ত কনজেকচার ইজ় সলভড।"

"নট ইয়েট," পূষণ বলল, "হোয়াট ইজ় ইট যেটা লুকিয়ে আছে পূজার ঘরে? তা ছাড়া সেটা আমাদের হাতে আসবে না।"

"কেন?"

"'তোমার পূজার ঘর' কথাটা ইমপ্লাই করে যে একটা 'আমার পূজার ঘর' ছিল। সেটা সত্যি-সত্যি ছিল কালিম্পং-এ। বাইরে পুজোর ঘর, যেখান থেকে বেরোনোর সময় গৌরীকান্ত খুন হয়েছিলেন আর ভিতরে ছিল ঠাকুরমার পুজোর ঘর। আমরা তো ভিতরে ঢুকে দেখিনি।"

মিত্রা বলল, "দেখা যাক। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একবার তো যাওয়া হবেই, জিনিসপত্রগুলো সরানোর জন্য। তখন দেখতে হবে।"

পূষণ আবার ডায়েরিতে মন দিল। একটা যখন সল্‌ভ হয়েছে বাকিগুলোও হবে। নেক্সট কনজেকচার *আখরে আদরে জাগে অজা বোধীসুখ*।

মিত্রা বলল, "অজা মানে তো ছাগল!"

"হ্যাঁ, আর আখর মানে কীর্তনে মূল গানের সঙ্গে যে পদটা বারবার বলা হয়। যেমন 'হরিবোল' বা 'জয় নিতাই' এরকম। আখরে আদর মানে সম্ভবত কীর্তন-টির্তনের দিকে ইন্ডিকেট করছে।"

মিত্রা বলল, "গৌরীশঙ্কর তো তান্ত্রিক, ওরা কি কীর্তন করে?"

"যত দূর জানি করে না।"

"তা হলে মানেটা কী দাঁড়াল? আখরে আদর অর্থাৎ বারবার আখর দিলে ছাগলদের বুদ্ধি খুলবে? হি হি হি।"

"বোধি বানানটা দেখেছ? বোধী! অদ্ভুত না? যাই বলো, তোমার প্রদাদু যন্তর জিনিস ছিলেন।"

মিত্রা ততক্ষণে উঠে গিয়ে ডিকশনারি বের করেছে। পাতা

উলটোতে-উলটোতে এক জায়গায় এসে স্থির হল। "এই দ্যাখো, আখর আর-একটা মানে আছে। অক্ষর।"

"আখরে আদর? আখর মানে অক্ষর। অক্ষর, অক্ষর, উম্‌ম..." পূষণ কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "ইয়া, গট ইট।"

"পেয়ে গিয়েছ?"

"ইয়েস ম্যাম। আখরে আদর মানে অক্ষরের দিকে গুরুত্ব দেওয়া। রাজীবজেঠু বলেছিলেন মনে আছে, আলি-কালি?"

"ও সেই স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের কথা?"

"হ্যাঁ। তার মানে ঘুরে ফিরে সেই প্রজ্ঞা আর উপায়। ওই একটাই কথা। হেরুক আর বজ্রবারাহী। তার সঙ্গে ওই বোধীসুখ। বললেই মহাসুখ মনে হয়, না?"

"আর অজা?"

"কোনো দেবী-টেবি হবে। রাজীবজেঠু বলেছিলেন না, এদের গাদা-গাদা দেবতা আছে? সেরকমই কেউ হবে।"

"কিন্তু নামটা কীরকম অদ্ভুত, না?" মিত্রা বলল।

"সো হোয়াট? হেরুকই বা কী এমন কমন নাম? গুলি মারো। সাড়ে বারোটা বাজে। আলো নিভিয়ে দিই।"

"ডু ইউ নো, পর্ণশবরী নামে এক দেবী আছেন? তিনি সমস্ত মহামারী, ন্যাচেরাল ক্যালামিটি থেকে রক্ষা করেন!"

"রাজীবজেঠুর থেকে ফান্ডাটা পেলে বুঝি?"

মিত্রা হাসল, "হ্যাঁ। ভাবছি পর্ণশবরীকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে রিলেট করে দেব। রাজীবজেঠু আসছেন।"

"কোথায়? আই মিন কবে?" পূষণ জিজ্ঞেস করল।

"এখনও ঠিক করেননি। বাবার কাছে আসছেন, কী কাজ আছে।"

পূষণ মিত্রাকে কাছে টেনে বলল, "আমি আলি, তুমি কালি। এবার আখরে আদর দেব!"

"তোমার মাথাতেও আসে," মিত্রা হাসল, "সেদিন কী যেন বললে? রেচ্ছা!"

"ধুর। রেচ্ছা ব্যাকডেটেড। এখন আমি হেরুক, তুমি বজ্রবারাহী।"

"এখন মহাসুখচক্র!" বলে মিত্রাও পূষণকে জড়িয়ে ধরল।

অনেকক্ষণ পর মিত্রা জিজ্ঞেস করল, "রেচ্ছা মানে কী?"

"র-ইচ্ছা, রেচ্ছা।"

"র মানে?"

"র এর তিনটে মানে আছে। র যখন স্ত্রীলিঙ্গ তখন তার মানে সোনা। যেমন তুমি আমার আদরের র।" পূষণ মিত্রার ঘাড়ে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল।

"যখন পুংলিঙ্গ?" মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"মহাসুখের পর জিজ্ঞেস করছ কী? পুংলিঙ্গ হলে র-এর মানে আগুন!"

"ধ্যাত! খালি আজেবাজে কথা!"

"তাও তো ক্লীবলিঙ্গটা শোনোনি। র যখন ক্লীবলিঙ্গ, তখন তার মানে কামানল।"

"তুমি কি রাতবিরেতে ইয়ারকি মারছ আমার সঙ্গে?"

"না রে ভাই," পূষণ তেড়ে উঠেছে, "অভিধান খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি!"

আলোটা জ্বালার সঙ্গে-সঙ্গেই মিত্রা হাউমাউ করে উঠল, "আহ্, আলোটা নেভাও না। অসভ্য একটা!"

॥ ৪ ॥

সকাল থেকেই আকাশ অন্ধকার। থেকে-থেকেই গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। ভোর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। পূষণ ন'টা নাগাদ একটা প্রেস মিটে বেরিয়ে গিয়েছে। টিপটিপ বৃষ্টিতে মিত্রা বেরোয়নি। ঘরে বসেই ল্যাপটপে কাজ করছিল। অনেকক্ষণ কাজ করার পর ল্যাপটপ বন্ধ করে মিত্রা আড়মোড়া ভাঙল। কোমরটা এপাশ-ওপাশ করে ছাড়িয়ে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ঠান্ডা হাওয়া চারদিক নাড়িয়ে দিয়ে গেল। ছোট-ছোট দুটো বাজ পড়ল। তারপরই বৃষ্টিটা জোরে এল।

মিত্রা খাটে গিয়ে বসল। পূষণটা কী করছে কে জানে! না ভিজলেই হল। পূষণের কথা মনে হতে মিত্রা উঠে বঙ্গীয় শব্দকোষ পেড়ে আনল। র নিয়ে কথাগুলো বানিয়ে বলল কিনা কে জানে!

পাতা উলটে মিত্রা দেখল, পূষণ বানিয়ে বলেনি। র মানে সত্যি-সত্যি ওসব! তার মানে প্রত্যেকটা অক্ষরের একটা করে মানে আছে? ও একদম গোড়ায় চলে গেল। 'অ' মানে ব্রহ্মা হয়, বিষ্ণু হয়, শিব হয়। 'আ'-এর গাদা-গাদা মানে রয়েছে। ও পাতা উলটে চলল। এই যে, হেরুক মানে মহাকাল, আবার হেরুক মানে গণেশও বটে। হেরুকের আর-একটা মানে বুদ্ধবিশেষ।

রাজীবজেঠু হেরুক শব্দটার অক্ষরগুলোর কী-কী যেন মানে বলেছিলেন। মিত্রা অক্ষরগুলো দেখতে থাকল। সেগুলো তো নেই! 'হে' মানে তো সম্বোধন, আবার 'হে' মানে আহ্বান। 'রু' মানে অনেক কিছু, গতি, হিংসা, কান্না, শব্দ, ধ্বনি। 'ক' মানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, আত্মা ইত্যাদি। 'ক' মানে সূর্যও হয়।

মিত্রা দেখল 'খ' মানে আকাশ। 'গ' মানে প্রাপক এবং গামী দুই-ই হয়। 'খগ' মানে আকাশগামী। তা হলে 'খক' মানে হওয়া উচিত আকাশে সূর্য। কিন্তু লোকে ধরে নেবে কাশি হয়েছে!

দেখতে-দেখতেই মিত্রা বুঝতে পারল, ডিকশ্‌নারি পড়ার মধ্যেও একটা মজা রয়েছে। ও তন্ময় হয়ে পাতা উলটে চলল আর ক্রমশ ওর চোখের সামনে নতুন একটা সত্য ভেসে উঠল।

আবিষ্কারের আনন্দে মিত্রা পূষণকে ফোনে ধরল। সুইচ্‌ড অফ। মিটিং-এ ঢুকে গিয়েছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি পূষণকে একটা এসএমএস করল মিত্রা আর সেই সময়ই অনির ফোনটা এল।

অনি পূষণের নম্বর ট্রাই করছিল। সেল অফ দেখে মিত্রাকে ফোন করেছে। অনির গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল যে, ও বেশ নার্ভাস হয়ে রয়েছে। সকালে উঠে দেখা গিয়েছে যে, কাঁকুড়গাছির বাড়ির সদর দরজার সামনে একটা কালো মোরগ গলা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। আর তাকে ঘিরে ওই রক্ত দিয়েই ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে। তার ভিতরে তিনটে জবা ফুল। বাড়ির সকলেই ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছে। আর সেটা খুব স্বাভাবিক। কোনদিক থেকে কীভাবে যে আক্রমণ আসছে, তার ঠিক নেই। শত্রু যে কে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।

কাল সারারাত রিয়া ঘুমোয়নি। বারবার উঠে বসেছে আর বলেছে, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে যেতে হবে। ছেড়ে দাও!"

শুনতে-শুনতে মিত্রার চুল খাড়া হয়ে গেল।

"জেঠুমণি বলছিল, পূষণদার যে বন্ধু ডিএসপি তাকে জানিয়ে রাখতে।" অনি বলল।

"হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে যে এবার শাক্যদাকে জানিয়ে রাখা দরকার।" মিত্রা বলল।

অনি গলা নামিয়ে বলল, "রিয়াদিটা কেমন হয়ে গিয়েছে। প্রায় দিনই রাতে ঘুমোয় না। শুধু কাঁদে। আর কী জোরে-জোরে কাঁদে রে মিত্রাদি! আমাদের এপাশ থেকে ওর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। আর কী বলে জানিস?"

"কী?" মিত্রা বুঝতে পারছে ওর নিজেরও নার্ভাস লাগছে।

"বলে, কেন তোমরা আমাকে ধরে এনেছ? আমাকে যেতে দাও।"

"কোথায় যেতে চায়?" মিত্রার গলা কাঁপছে।

"জানি না!" অনিও ভয় পেয়েছে।

"মা আছে? ডাক তো! তোর সঙ্গে পরে কথা বলছি।"

সুনন্দার সঙ্গে মিত্রা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। রিয়া বেশ সেরে উঠছিল। গত কয়েকদিনে হঠাৎ এই অবস্থা হয়েছে। সবিতা আর সুনীল খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। বাড়ির পুরোহিত বলেছেন, একটা স্বস্ত্যয়ন করিয়ে নিতে। যাই হোক না কেন বসতবাড়িতে অলুক্ষুনে রক্তপাত ঘটছে।

সুনন্দার মুখে এই কথা শুনে মিত্রা বলল, "ভালই তো। করিয়ে নাও।"

"করিয়ে তো নেওয়াই হবে। কিন্তু অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে," সুনন্দা বললেন, "এমনি একটা স্বস্ত্যয়ন করানো যায়। আবার নতুন ভিতপুজো, বিগ্রহপুজোও করা যায়। তোর কাকাদের ইচ্ছে নতুন করে সব হোক। তোর বাবা বলছেন, এত খরচের দরকার নেই। অল্পের উপর দিয়ে যা করা যায়!"

"সকলে যদি বলে নতুন করে সবকিছু করতে, তা হলে করা হোক। কিন্তু আমার মনে হয় বেশি খরচ করার দরকার কী?"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে মিত্রা ফোন রেখে দিল।

পূষণের নম্বরটা আবার ট্রাই করল মিত্রা। এখনও সুইচ্‌ড অফ। বাধ্য হয়ে নিজেই শাক্যকে ফোনে ধরল মিত্রা। ওর বউ ভাস্বতী মিত্রার স্কুলের বন্ধু। শাক্য সব শুনে লোকাল থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে রাখতে বলল। থানাকে যা বলার ও বলে দেবে।

প্রেস মিট শেষ করে পূষণ মোবাইল অন করতেই আটকে থাকা মেসেজগুলো হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করল। এতগুলো মিস্‌ড কল কেন? আবার কী হল?

লাঞ্চের জায়গা থেকে একটু সরে এসে ফোন করতেই মিত্রা সমস্ত ঘটনা জানাল। এও বলল যে, শাক্যকে জানানো হয়ে গিয়েছে। আরও একটা-দুটো কথা বলে পূষণ ফোন রেখে দিল। তারপরই ওর চোখে পড়ল মিত্রা একটা এসএমএস করেছে।

লেখাটা পড়ে পূষণের মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। ইজ় ইট ট্রু? আশ্চর্য মেয়ে তো মিত্রা! এতক্ষণ কথা বলল আর এটা নিয়ে কিছুই বলল না! পূষণ সঙ্গে-সঙ্গে মিত্রাকে আবার ফোন করল। কিন্তু লাইন বিজ়ি। বেশ কয়েকবার ট্রাই করেও লাইন পাওয়া গেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে পূষণ লাঞ্চের টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। সবে দু'-তিনটে গ্রাস মুখে পুরেছে, এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল।

পূষণকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই ও প্রান্ত থেকে মিত্রা হড়বড় করে বলতে শুরু করল। বোঝাই যাচ্ছে, ও খুব ভয় পেয়েছে।

শুনতে-শুনতেই পূষণ বলল, "শিট!" তারপর বলল, "ঠিক আছে। আমি দেখছি।"

ফোন রেখে দিয়েও ও ঠিকমতো খেতে পারল না। তাড়াতাড়ি শাক্যকে ফোনে ধরল। আরও দু'-তিনজনকে ধরল। কথা বলতে-বলতেই যা খাওয়ার খেল। তারপরে প্লেট নামিয়ে রেখে হাত মুছে বেরিয়ে এল।

মিত্রা জানিয়েছে যে, কাঁকুরগাছির বাড়ির সদর দরজার সামনে লাল চন্দন মাখানো তিনটে ধুতরো ফুল পাওয়া গিয়েছে। কোথা থেকে এল? কে রেখে গিয়েছে?

॥ ৫ ॥

রিয়া একলাই ঘরে বসে ছিল। মনটা ভাল নেই। কেন বারবার ওকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে? ওকে কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু রিয়া জেনে গিয়েছে, বাড়ির সামনে নাকি গত তিনদিন ধরে রোজ একটা করে গলা কাটা পাখি পাওয়া গিয়েছে। একদিন মুরগি, একদিন পায়রা আর একদিন কাক।

রিয়া প্রায় রোজই ঘুমের ঘোরে দেখতে পায়, একটা অন্ধকার ঘরে ও শুয়ে রয়েছে আর নীল রঙের একটা লোক ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করছে। ওর বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। ও প্রাণপনে বলার চেষ্টা করে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে হবে। ছেড়ে দাও! আর ততই ওই লোকটা ওর উপর চেপে বসে। ওর ঘুম ভেঙে যায়।

একটা খুটখাট শব্দ শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাল রিয়া। আজকাল ভীষণ ভয় করে। শুধু মনে হয়, নীল-নীল দেখতে লোকগুলো ওকে ধরতে আসছে। তাকিয়ে দেখল অনি ঢুকছে।

"কী খবর রে নীচে?" রিয়া জিজ্ঞেস করল।

"এখনও পুজো হচ্ছে," অনি ড্রয়ার ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বলল, "তারপর বিসর্জন হবে।"

"সবাই এসে গিয়েছে?"

রিয়ার কথার উত্তর না দিয়ে অনি জিজ্ঞেস করল, "তুই নীচে যাবি না?"

"নাহ্! তুই যা।"

অনি আর দাঁড়াল না। নীচে পূষণদা একদম হইচই ফেলে দিয়েছে।

রিয়া একলা বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। এভাবেই কি জীবনটা চলবে? যে কথাটা আজ পর্যন্ত বলা হয়ে উঠল না, সেটা আর হবেও না। বাবা-মা যার সঙ্গে বিয়ে দেবে, সেখানেই চলে যেতে হবে। আর-একবার ওর শরীরটা অন্য লোকের হাতে পড়বে। ভাবতে-ভাবতেই দেখল মিত্রাদি ঢুকছে।

মিত্রা এসেই ওর হাত ধরে টানল, "চল নীচে চল। সবাই নীচে আর তুই এখানে একলা কী করছিস? চল!"

"ভাল লাগছে না। তোরা দেখছিস, দ্যাখ না। আমাকে টানছিস কেন?"

মিত্রা ওর আপত্তিকে পাত্তাই দিল না। টানাটানিতে রিয়া বাধ্য হয়ে নীচে নামল। এই বাড়িতে ঢোকার পর থেকে ও আর বাইরে বেরোয়নি।

মন্দিরে পুরোহিতমশাই পুজো করছিলেন। পূষণ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কথাতেই এটা হচ্ছে। বাড়ির প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা কম কথা নয়। রিয়াকে নিয়ে নীচে নেমে, মিত্রা ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে ইশারা করল। সব ঠিক আছে তো?

পূষণ কনফিডেন্টলি হাসল। কিন্তু ও জানে, এই কনফিডেন্সটা লোক দেখানো। ভিতরে-ভিতরে ওর যথেষ্ট টেনশন হচ্ছে। যে অঙ্ক কষে ও শিবলিঙ্গ সরানোর কথা বলেছে, সেটা যদি ভুল হয় ও মুখ দেখাতে পারবে না। অন্য সময়ে হলে হয়তো ওর কথায় কেউ কান দিত না। যেহেতু আবার নতুন করে উৎপাত শুরু হয়েছে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা উঠেছে, তাই গাঁইগুঁই করলেও মৃগাঙ্করা রাজি হয়েছেন। পুরোহিতমশাই ইতিহাস ঘেঁটে ভুরি-ভুরি উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করতে হয়েছে। প্রথমে একে বিসর্জন দিতে হবে। তারপর সরিয়ে নিয়ে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

একটা পাশে সরে এসে পূষণ পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করল। *ঠগ হলে ঠগ হবে*, সেদিন যখন ও প্রেস কনফারেন্সে ছিল, মিত্রা এসএমএস করেছিল, "অজা হ্যাজ় বিন ডিটেক্টেড, থ্যাঙ্কস টু ইয়োর রেচ্ছা!"

বঙ্গীয় শব্দকোষ ঘাঁটতে ঘাঁটতে মিত্রা দেখতে পেয়েছিল, অজা মানে ছাগল, অজা মানে আদ্যাশক্তি। মেয়ে ছাগলের কোনও মানে হয় না, কিন্তু আদ্যাশক্তি সেন্সে ধরলে বাক্যটার একটা মানে পাওয়া যায়। ঘুরে ফিরে সেই প্রজ্ঞা আর উপায়।

তারপরই ওর মাথায় আর-একটা অর্থ ঝাঁপিয়ে এসেছিল। 'অজ' মানে 'অ' থেকে জাত। শুরুতেই রয়েছে অ মানে ব্রহ্মা, আবার অ মানে শিব! তা হলে অজা মানে যে নারী ব্রহ্মা থেকে জন্মেছে বা শিব থেকে জন্মেছে। অর্থাৎ সরস্বতী!

যদি সরস্বতীই হয় তা হলে বোধিকে বোধী লেখার একটা কারণ পাওয়া যায়। ধী। সরস্বতী তো ধী-এরই দেবী। *কমলে কুলিশ হেরি ভাতিল শ্রীমুখ,* শ্রী মানে লক্ষ্মীও হয়, সরস্বতীও হয়। *বিবাদী বা বাদী ছাড়া ব্রাহ্মী বিমুখ,* ব্রাহ্মী মানে সরস্বতী। আর *আখরে আদরে জাগে অজা বোধীসুখ,* অজা মানেও সরস্বতী।

রাতে দু'জনে আবার ওগুলো নিয়ে বসেছিল। *ঠগ হলে ঠগ হবে,* প্রথম ঠগের নীচে হলুদ আন্ডারলাইন। পড়তে-পড়তে সবটাই চোখের সামনে খুলে গেল। আনন্দে, উত্তেজনায় পূষণ আর মিত্রা কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

পূষণ কাগজটা আর-একবার পড়ল। মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের দু'পাশে দুটো শিবমন্দির আছে। ডান দিকে জলেশ্বর শিব আর বাঁ দিকে রত্নেশ্বর শিব, ১৯২৩ সালে গৌরীশঙ্করের স্ত্রী রত্নাবলী দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেওয়ালের গায়ে ক্ষীণ লেখাটা এখনও পড়া যায়।

হলুদ আন্ডারলাইন। রাজীবজেঠু বলেছিলেন, হলুদ রং ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের প্রতীক। রত্নসম্ভব, রত্ন, রত্নেশ্বর শিব। রত্নাবলী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বলেই কি 'তোমার পূজার ঘর'?

মিত্রা আর পূষণ এটা নিয়ে কল্লোলের সঙ্গেও আলোচনা করেছে আর রাজীবজেঠুকেও ফোন করেছে। দু'জনেই বলেছেন, যুক্তিতে কোনও ভুল নেই।

এমনকী কল্লোল বলেছিল, যেদিন কাজটা হবে, সেদিন ও নিজেও হাজির থাকবে। তাও হয়তো এই ব্যাপারে কাউকেই রাজি করানো যেত না। কিন্তু যেহেতু পুরোহিত নতুন করে স্বস্ত্যয়নের কথা বলেছিলেন, তাই সকলে নিমরাজি।

পুজো শেষ করে শিবলিঙ্গের বেদিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পূষণের বুক গুড়গুড় করে উঠল। কোথাও কোনও ভুল নেই তো? আড়চোখে দেখল, মিত্রা ডানহাতটা কপালে ঠেকাল। বেদিটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। একটা বেদির উপর উলটো করে আরেকটা বসানো। তার উপরে রত্নেশ্বর শিব। বেদি দুটোর মধ্যের ফাঁকটা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু তার ভিতরে আশি-পঁচাশি বছরের জমাট অন্ধকার!

বেদির চারপাশ দিয়ে ড্রিলিং শুরু হল। মেঝেতে বেশ খানিকক্ষণ ড্রিলিং মেশিনটা ঘুরতেই বোঝা গেল নীচটা ফাঁপা। পূষণ আর মিত্রা দু'জনেরই সাংঘাতিক টেনশন হচ্ছে। মৃগাঙ্ক, সুধাংশু ,অভ্র তিনভাইও টেনস্‌ড।

মৃগাঙ্কর হঠাৎ করেই খুব নার্ভাস লাগতে শুরু করল। ইচ্ছে হল, চেঁচিয়ে এসব বন্ধ করে দিতে! কিছু গন্ডগোল হলে সারা জীবন ভাইরা তাঁকেই দোষ দেবে। আফটার অল, পূষণ তাঁর জামাই। পূষণ একটু হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। যদিও ওর নিজের বুকও ধুকপুক করছে। *আখরে আদরে জাগে অজা বোধীসুখ,* আখরে আদর দিতে গিয়েই ও ধাঁধাটা ধরতে পেরেছে। এখন ভালয়-ভালয় শেষ রক্ষাটা হলে হয়। ড্রিলিং মেশিনের বদলে এবার গাঁইতি। তার ধাক্কায় দুই বেদির ফাঁকে আশি-পঁচাশি বছর পর আলো ঢুকছে। পুরোহিত মশাই বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছেন আর সাবধান করছেন বিগ্রহের গায়ে যেন গাঁইতির খোঁচা না লাগে। সিমেন্ট বালি ছিটকে-ছিটকে আসছে আর সেইসঙ্গে পূষণের রক্ত চলাচল দ্রুত হচ্ছে।

॥ ৬ ॥

দোতলায় মৃগাঙ্কদের বসার ঘরের বিরাট টেবলটা ঘিরে সন্ধেবেলা সকলে বসেছিল। বাড়ির লোকজন ছাড়াও পূষণের দুই বন্ধু, কল্লোল আর শাক্যও রয়েছে। এদের দু'জনকেই মিত্রাদের বাড়ির সকলে চেনে।

টেবলের উপর একটা দশ ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি তামার পাত রাখা রয়েছে। তার উপরে সোনার জল দিয়ে একটা পদ্মফুল আঁকা। তার পাপড়িগুলো যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে আর-একটা কিছু আঁকা, যেটা বাকিরা কেউ ধরতে পারেনি। পূষণ বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ওটা বজ্র। পদ্মের উপর বজ্র। তার উপর একটা সিংহ। সিংহের পিঠে আর-একটা পদ্ম। পদ্মের উপর ডান পা আর সিংহের পিঠে বাঁ পা রেখে একজন দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দু'হাতে বীণা ধরা রয়েছে আর বাকি দু'হাতের একটাতে বই আর অন্য হাতে মালা। সিংহের বাঁ দিকে একজন হাতজোড় করে বসে আছে।

“সিংহবাহনা সরস্বতী,” টেলিফোনে পুরো ছবিটার বর্ণনা শুনে ওপাশ থেকে রাজীববাবু বললেন, “ওটাও বৌদ্ধদের দেবী। বৌদ্ধদের বিদ্যার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ। সেই জন্যই তার শক্তি সরস্বতীরও বাহন সিংহ!”

আলোচনা চলছে তামার পাতটা নিয়ে কী করা হবে। সুনন্দার বক্তব্য ওটাকে মিউজ়িয়ামে দিয়ে দেওয়া উচিত। উনি বললেন, “আমরা তো এত বছর ধরে জানতামই না যে ওটা এখানে আছে। কাজেই ওটা থাকা না থাকা আমাদের কাছে সমান। উলটে ওর জন্যই যাবতীয় অশান্তি!”

রিয়া কথাটা শুনেই তাকাল। কল্লোলদা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। রিয়া আবার চোখ নামিয়ে নিল। এরা সকলেই কি ওর ঘটনাটা জানে? ও আড়চোখে একবার পূষণকে দেখল।

সুনন্দা ততক্ষণে বললেন,“যতক্ষণ ওটা থাকবে, ওই লোকগুলো পিছনে লেগেই থাকবে। তার চেয়ে ওকে মিউজ়িয়ামে দিয়ে দেওয়াটাই ভাল।”

দেখা গেল অধিকাংশেরই তাতে সায় নেই। আলোচনা শুনতে-শুনতেই মিত্রা পাতটাকে হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখছিল। একদিকে সরস্বতীর ছবি। অন্য দিকে চারটে খোপ। প্রত্যেকটা খোপের নীচে দুর্বোধ্য স্ক্রিপ্টে কী সব লেখা। এটাই কি সেই রাজা ইন্দ্রভূতি না লক্ষ্মীঙ্করা, কার যেন দেওয়া ফলক? এর মধ্যেই কি সেই উড্ডীয়ানের খোঁজ রয়েছে যার জন্য গৌরীকান্ত রায় খুন হয়েছিলেন? এর জন্যই এত ঝামেলা? কী ভাষায় লেখা?

সুধাংশু বললেন, “এর জন্যই যখন এত উৎপাত, তখন এটা মিউজ়িয়ামে দিয়ে দিলেই কি সব মিটে যাবে? যারা ওই উৎপাত করছে, তারা তো আর জানতে পারবে না যে, এটা মিউজ়িয়ামে আছে না আমার ভল্টে আছে!”

কথাটা শুনেই সুনীল ভুরু কুঁচকে তাকালেন। আমার ভল্ট বলতে মেজ শালা কী বলতে চাইছে? ও কি এটা হাতানোর তালে আছে? এমনিতেই তিন শালাকে সুনীল পছন্দ করেন না। ওদের পাল্লায় পড়েই মেয়েটার এই দুর্গতি!

“সে কি আর জানবে না? ঠিক জানবে!” নীলিমা বললেন।

“কী করে জানবে? তা হলে তো আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হয় যে, আমরা এরকম পেয়েছি এবং সেটা মিউজ়িয়ামে দিয়ে দিচ্ছি।” অভ্রশেখর বললেন।

মিত্রা আবার সরস্বতীর ছবিটা দেখল। এই সেই অজা, এই সেই ব্রাহ্মী। গৌরীকান্ত রায় বুঝতে পেরেছিলেন, এটা হাতানোর জন্য হেরুকপন্থীরা পিছনে লেগেছে। সেজন্যই তিনি শিবলিঙ্গের বেদির নীচে একে লুকিয়ে রেখে উত্তরপুরুষদের জন্য সংকেত দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা যদি উনি ওদের হাতে দিয়ে দিতেন, তা হলে অকালে মরতে হত না। সেই জিনিসকে মিউজ়িয়ামে দিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? সেটা করলে গৌরীকান্তের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা হবে না কি?

মিত্রার কথা শুনে অভ্র বললেন, “ও ঠিকই বলছে। যদি এটা আমাদের ফ্যামিলিতে না-ই থাকল, তা হলে আর বেচারা বেঘোরে প্রাণটা দিল কেন?”

অনি আর কিঙ্কর ছটফট করছে কী করে পূষণদা রহস্যটা ভেদ করল জানার জন্য। ওদের মনের কথাটা শাক্যর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, “শিবলিঙ্গের নীচে যে কিছু থাকতে পারে, সেটা তোর মাথায় এল কী করে?”

রিয়াও উদগ্রীব হয়ে তাকাল। কেন জানি ওর হঠাৎ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ভীষণ! ভাগ্যিস ও মরে যায়নি! আজ কোনও একটা সময় পূষণদাকে সেই স্পেশ্যাল কথাটা বলতে হবে। কিন্তু কখন বলবে? তার জন্য তো ওকে আলাদা করে ডাকা দরকার। রিয়া কী ভেবে উঠে দাঁড়াল। বলল, “আমি একটু আসছি।”

“কোথায় যাচ্ছিস? গল্পটা শুনবি না?” সবিতা বললেন।

“আসছি। তোমরা শুনতে থাকো না!” রিয়া বেরিয়ে গেল।

সকলের দিকে তাকিয়ে পূষণ গোড়া থেকে ব্যাখ্যা শুরু করল। কীভাবে বঙ্গীয় শব্দকোষ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে মিত্রা হঠাৎই অজা শব্দটার মানে বের করে ফেলেছিল।

“তারপর আমরা ঠগ শব্দটা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। ‘ঠ’ হরফটার দুটো মানে হয়। ‘ঠ’ মানে শিবও হয় আবার প্রতিমাও হয়। সেরকম ‘গ’ মানে গামী, যেমন খগ, ভূজগ। আবার গ-এর

আর-একটা মানে পাওয়াও হয়, যেমন হস্তগ। যেহেতু আখরে আদর দিতে হবে, সেইজন্যই ‘ঠগ’ শব্দটাকে আলাদা-আলাদা করে পড়ে দেখলাম...” হঠাৎ পূষণের সেলফোনে শব্দ হল। একটা এসএমএস এসেছে।

এসএমএস-টা পড়ে পূষণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “ আমাদের হাতে রয়েছে ঠ আর গ। দুটোরই দুটো করে মানে। মোট চারটে কম্বিনেশন...”

আবার পূষণের সেলফোনে একটা এসএমএস এল। সেই একই এসএমএস।

“ওফ, পূষণদা সেলফোনটা অফ করে দাও!” দিয়া বলল, “এই এসএমএসগুলো এত জ্বালায় না!”

সকলে পূষণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আচমকা বাধা পড়ায় সকলেরই মনের ভাব এক। পূষণ মুচকি হেসে মেসেজটা আর-একবার দেখল। লেখা আছে, ‘‘বেশিক্ষণ গল্প না করে প্লিজ় একবার আমার কাছে এসো। একলা। খুব দরকারি কথা আছে। প্লিজ় !’’ মেসেজটা ডিলিট করে, ফোনটা সাইলেন্ট মোডে রেখে পূষণ আবার বলতে শুরু করল, “আমাদের হাতে রয়েছে চারটে কম্বিনেশন, শিবগামী, শিবপ্রাপক, প্রতিমাগামী, প্রতিমাপ্রাপক। এদিকে প্রথম ঠগের নীচে হলুদ আন্ডারলাইন। দ্বিতীয় ঠগের নীচে সেরকম নেই। রাজীবজেঠু বলেছিলেন, হলুদ রং ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের প্রতীক। রত্নসম্ভব, আর রত্নেশ্বর শিব! একই রকম শুনতে লাগে। আবার রত্নাবলীদেবী তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মানে হয়তো ‘রত্ন’ শব্দটার উপরে জোর দিতে চাইছে। তা হলে প্রথম ঠ-টা শিব রিলেটেডই হবে। অন্যদিকে গৌরীকান্ত তাঁর ছেলেকে চিঠিতে বলছেন, সে যেন সুরকে কখনও অবহেলা না করে। সুরের দিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে বেরিয়েছে যে কোনও একটা জিনিস, লুকিয়ে আছে তোমার পূজার ঘরে। এই দুটোকে একসঙ্গে মেলাতে সব ক্লিয়ার হয়ে গেল। প্রথম ঠগ মানে রত্নেশ্বর শিবকেই বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয়টা যাই হোক না কেন, আগে রত্নেশ্বর শিবমন্দিরে খুঁজতে হবে! কিন্তু কোনখানে? শিবগামী বা শিবপ্রাপক, যে অর্থই ধরা হোক না কেন, সামহাউ শিবের কাছেই যেতে হবে। অর্থাৎ বেদির নীচে কিছু থাকার সম্ভাবনা। তারপর তো দেখাই

গেল। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল, আমরা শিবগামী হলাম বলেই সরস্বতী বেরিয়ে এল। অর্থাৎ আমরা প্রতিমাপ্রাপক হলাম।”

দিয়া, কিঙ্কর আর অনি একসঙ্গে বলে উঠল, “ওয়াও! গ্রেট!”

সুধাংশু বললেন, “একসেলেন্ট! আমার মনে হয়, পূষণ আর মিত্রার কাছেই এটা থাকা উচিত। কী বলো তোমরা?” সকলে হইহই করে সমর্থন করল। সুনীল ঈর্ষাকাতর চোখে তাকালেন পূষণের দিকে। তিনিও তো বাড়ির জামাই! সব খাতির শুধু ওরই?

এসএমএসটা পাঠিয়ে রিয়া দরজার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। কখন আসবে সে? এখনও বকবক করছে? এসএমএসটা কি যায়নি? রিয়া দেখল যে, মেসেজ ডেলিভার্ড দেখাচ্ছে। তা হলে পূষণদা আসছে না কেন? রিয়া ছটফট করতে শুরু করল।

আসলে পূষণদাকে দেখতে-দেখতে হঠাৎই ওর মনে হয়েছে, যেহেতু ওই ফলকটা আজ উদ্ধার হয়েছে, এটা একটা শুভ ইন্ডিকেশন। কাজেই আজই পূষণদাকে আলাদা ডেকে নিয়ে সেই কথাটা বলে দেওয়া দরকার। আজ না বলতে পারলে আর কোনওদিনই পারবে না। কিন্তু কীভাবে বলবে? ঠিক কী-কী বলবে?

‘তোমার বন্ধু কল্লোলদাকে আমার খুব ভাল লাগে,’ বলবে না কি ‘কল্লোলদাকে আমি ভালবাসি’? ‘কল্লোলদাকে আমি...’’ এটুকু বলেই ছেড়ে দিলেও হয়। কিন্তু অর্ধেক বললে পূষণদা বুঝতে পারবে? ও আবার মেয়েদের ব্যাপারে যা হাঁদা!

কিন্তু সে কই? এখনও গল্প শেষ হয়নি? এসএমএস-এর কম্মো নয়, একটা মিস্ড কল দেওয়া যাক। মোবাইলের বোতাম টিপতে-টিপতে ওর মনে হল, কল্লোলদাকে সবুজ টি-শার্টটাতে ব্যাপক দেখাচ্ছে। কলটা হতেই রিয়া শুনল ওপাশে রিং হচ্ছে। ওয়াও! কলার টিউনটা হেব্বি নামিয়েছে তো! গলাটা কার? মিস্ড কল দেবে ভেবেছিল, কিন্তু সেটা ভুলে রিয়ার কানে ফোন রেখে শুনতে থাকল, ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ’।